বিজ্ঞান স্যার

– জুননুন যশোরী

তখন স্কুলে পড়ি। ক্লাস নাইনে কিংবা টেন–এ। মফস্বলের স্কুল হলেও স্কুলের দোতলা বিল্ডিংই ছিল তখন এলাকার একমাত্র উচু ভবন। এলাকায় স্কুল ভবনটি যেমনি মাথা উচু করে সবার উপরে দাড়িয়ে আছে, রেজাল্টেও তেমনি।

অভিজ্ঞ স্যারদের পাঠ দেয়ার রীতি, পাঠ নেয়ার বাধ্যবাধকতা লেখাপড়ার প্রতি সব সময় আমাদের মনোযোগী রাখতো। বিশেষ করে বিজ্ঞানস্যারের পড়া আদায়ের কড়াকড়ি আমাদের ভীত রাখতো সারাক্ষণ। বেত ছাড়া তিনি কখনো ক্লাসে আসতেন না। কেউ পড়া না পারলে মোটা লেন্সের চশমার উপর দিয়ে দেয়া অগ্নিদৃষ্টিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু না মেরে তিনি ক্লাস ছেড়েছেন এমন নজির খুব কমই ছিল।

আমাদের বিজ্ঞানের ক্লাসগুলো দোতলায় হতো। কোনো একদিন স্যার ক্লাসে এলেন যথারীতি বেত হাতে। কারোরই পড়া হয়নি। কারণ আমরা ভেবেছিলাম স্যার আজ স্কুলে আসবেন না। শরীর খারাপ। কিন্তু স্যার এসে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর বেত রেখে আমাদের বসতে বললেন।

সবার মুখ ফ্যাকাশে। রুমের মধ্যে অদ্ভুত নীরবতা। বেত হাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে প্রথমে আমার পাশে বসা ফার্স্ট বয়কে পড়াটা ধরলেন।

ফার্স্ট বয় নিজের অপারগতা স্বীকার করলে তিনি হাত পাততে বলে এমনভাবে বেত চালালেন যে, আমার অন্তরাত্মা কেপে উঠলো। দুই হাতে দুটা বাড়ি খেয়ে সে দুহাত চেপে ধরে বসে পড়লো।

এবার এলো আমার পালা। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইলাম।

স্যার বুঝতে পেরে হাত পাততে বললেন।

ভয়ে কোনোভাবেই হাত পাততে পারলাম না।

স্যার আরো বেশি রেগে খুব কাছে এসে আমার পিঠে বেত চালালেন।

জানালার পাশে দাড়ানো নিজের মাথা আর মুখ বাচানোর জন্য দুই হাতে আকড়ে ধরলাম। কিন্তু কেমনভাবে জানি আমার হাত স্যারের নাকে লেগে স্যারের চশমাটা খুলে জানালা দিয়ে সোজা বাইরে গিয়ে পড়লো।

স্যার থেমে গেলেন।

আমি মাথা নিচু করেই দাড়িয়ে রইলাম।

স্যার অন্যদের পাঠালেন চশমা খুজতে।

লজ্জায় আমার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা নেমে এলো।

চশমা আনতে অন্যদের আসতে দেরি দেখে স্যার নিজে নিচে নেমে গেলেন।

পুরো স্কুল জানাজানি হয়ে গেল। সব স্যার ঘটনাস্থল তন্ন তন্ন করে দেখলেন। কিন্তু কিছুতেই চশমাটা পাওয়া গেল না। কারণ চশমাটা পড়েছিল স্কুলের ভবনের পেছনের পচা ড্রেনের মধ্যে যেখান থেকে চশমাটা উদ্ধার করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

লজ্জায় আমি রুম হতে বের হতে পারছিলাম না। পরে হেডস্যার গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে আমাদের নিচে এনে অন্যদের সঙ্গে ক্লাসে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

আজও সে কথা মনে পড়লে লজ্জায় আমার দুই চোখ ছল ছল করে ওঠে।

বাঘারপাড়া, যশোর থেকে

মনে পড়ে

– মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

আমি চার বছর বয়সেও ছিলাম তোতলা। আধো আধো কথা বলি। এতে করে সবাই আমার কথা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতো। আমার হৃষ্ট–পুষ্ট শরীর থাকায় সবাই আমাকে আদর করতো।

একদিনের ঘটনা আমার দাদি চশমা পরে সুচে সুতা পরাবেন। ঠিক এমন সময় আমার আম্মার কোল থেকে এক হিসেবে জোর করে নেমে গেলাম।

আম্মাও আমার নাছোড় ভাব থেকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন।

আমার দাদি অবসর কাটানোর জন্য পুরনো কাপড়ে কাথা সেলাই করতেন চশমা পরে। খুবই সুন্দর করে কাথা পাততেন দাদি। সেগুলো সেলাই করে আমার আত্মীয়স্বজনদের ভেতর বিতরণ করতেন। দাদি একজন বিধবা মহিলা। বাড়ির কাজ তেমন ছিল না। তাই দাদি কাথা সেলাই করতেন। আম্মুও কিছু বলতেন না। তিনি ভাবতেন বুড়ো মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তা–ই করছেন। তবে আম্মা মাঝে মধ্যে বলে উঠতেন, আপনি রাখেন এসব। যার দরকার সে লোক দিয়ে সেলাই করে নেবে।

আম্মুর কথা শুনে আমার দাদি বলতেন, আমার পুতা–পুতনিরা অন্যের তৈরি কাথা ব্যবহার করবে, সেটা আমি বেচে থাকতে অসম্ভব।

আমি সোজা দাদির কাথার ডালার কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। দাদি সুচে সুতা গাথতে না পারাতে দাদিকে ভাঙা ভাঙা ভাষায় বললাম, দাদি, তো–মা–র চশমা আমাকে দাও, আমি তোমার সুইতে সুতো পরিয়ে দিচ্ছি।

দাদি আমার কথা শুনে আমাকে কোলে তুলে নিলেন আর বললেন, না, না ভাই, এতো বড় উপকার করতে হবে না, আমি পারবো পরাতে।

দাদিকে বুঝ দিলাম, *দেখ না আমি কি করি*। তাই বলে দাদির চোখের চশমা আমার নাকের ওপর তুলে নিই। অনেক চেষ্টা করেও আমি সুচে সুতা পরাতে পারি না।

দাদি আমাকে আদরে ভরিয়ে দিয়ে মাকে ডেকে মায়ের কোলে তুলে দিলেন। কিন্তু আমি আর চশমা ফেরত দিতে রাজি না। দাদির চশমা ফেরত দেইনি। মা আমাকে কতো জিনিসের লোভ দেখালেন,তাতে আমার মন গলাতে পারলেন না।

যখন চাচাতো ভাই রাজু নারিকেল পাতার তৈরি চশমা আনলো তখন সেই চশমা নিয়ে মায়ের কোল থেকে লাফিয়ে গিয়ে দাদির চশমা ছেড়ে দিয়ে নারিকেলের পাতার তৈরি চশমা নিতে আগ্রহী হলাম। গ্রামে বাড়ি। তাই তখনকার সময়ে গ্রামের ছেলেরা নারিকেল পাতার চশমা বানিয়ে চোখে চশমা পরতো। খুব ভালো খেলা ছিল একটা।

দাদির চশমাটা আমার হাত থেকে ফ্লোরে পড়ে যাওয়ায় চশমার একটি গ্লাস ভেঙে গেল। আম্মু খুবই রাগ করলেন আমার ওপর। কারণ আমার কতো রকম লোভ দেখিয়েও দাদির চশমাটা আমার হাত থেকে নিতে পারেননি।

আমার ওপর মায়ের অগ্নিশর্মা ভাব দেখে মায়ের কাছ থেকে আমাকে দাদি নিয়ে নিলেন তার কোলে। আমি তখন মায়ের বকুনি খেয়ে অশ্রুসজল। দাদি আমাকে আদর করতে করতে বললেন, আমার দাদুভাই যখন বড় হয়ে চাকরি করবে তখন আমার একটা সুন্দর চশমা কিনে দেবে। দাদি বললেন, কি, দেবে না ভাই?

বললাম, দিবানে।

দাদি আমাকে খুব আদর করলেন।

কয়েকদিন পর আমার দাদির জন্য নতুন একটা চশমা আনতে বলাতে চশমা পুরনো প্রেসক্রিপশন চাইলেন আম্মার কাছে আব্বু। আব্বু অফিস হতে ফেরার সময় চশমা এনে দেবেন বলে আমাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

আমি, আম্মা, দাদি, আমরা সবাই আব্বুর চলে যাওয়া দেখলাম। আব্বুকে বললাম চিৎকার করে, আব্বু, আমার জন্য চিপস আর দাদির জন্য... বলার সঙ্গে সঙ্গে আব্বু প্রতিউত্তরে বললেন, চশমা।

বললাম, ঠিক।

আম্মু আর দাদি হেসে উঠলেন।

তখন বিকাল সাড়ে পাচটা, জুলাই মাস। হঠাৎ টেলিফোনে রিং এলো, এটা কি আজম সাহেবের বাসা? আম্মু রান্না করে ব্যস্ত থাকায় দাদি ধরলেন ফোন।

ভদ্রলোক বললেন, আজম সাহেব গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছেন।

আমার দাদি ছিলেন হার্টের রোগী। আমার আব্বুর লাশ না আসতে আসতেই দাদি ওই খবর শুনে মারা যান। আব্বুর লাশের সঙ্গে এসেছিল দাদির চশমা আর চিপসের প্যাকেট। আমি তখন খুব বেশি বুঝতাম না। তাই দাদি আর আব্বু ঘুমানো অবস্থা দেখে, অনেক লোক দেখে বলছিলাম, এতো লোক কেন বাসায়? দাদি আর আব্বুর কি হয়েছে আম্মু?

আম্মু তখন অশ্রুসজল।

দাদি আর আব্বুর স্মৃতি হিসেবে আছে শুধু আব্বুর চোখের চশমা আর দাদির কাথা। বাসা বদল হওয়াতে দাদির চশমাটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

ঝিকরগাছা, যশোর থেকে

দাম

– সাজিয়া

আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে তুষার ছোট। ক্লাস নাইনে ওঠার পর তার চোখের সমস্যা এবং মাথা ব্যথা সমস্যা দেখা দেয়। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে চশমা ব্যবহার করতে হলো।

প্রথমে আব্বু সাধারণ একটা ফ্রেমের চশমা কিনে দেন। এর কিছু দিন পর খালাতো ভাইয়া ব্যবসার কাজে আমেরিকা যান। সেখান থেকে সবার গিফটের সঙ্গে তুষারের জন্য খুব সুন্দর গোল্ডেন রঙ–এর একটা দামি চশমার ফ্রেম নিয়ে আসেন। সেটা তার এতোই পছন্দ হয় এবং চেহারার সঙ্গে এতো মানানসই ছিল যে, তা তুষারের ফেভারিট জিনিস হয়ে যায়।

এভাবে দিন ভালোই যাচ্ছিল। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর তারিখটা মনে নেই। তার টেস্ট পরীক্ষা সেদিন শেষ হয়েছে। পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়াতে সে একাউন্টিং পড়তে যেতো। এবং সেদিনই সে সেখানে যাবে স্যারের বেতন দিতে। পরীক্ষা দিয়ে এসে, দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় সে স্যারের বাসায় যাবে।

আম্মু নিষেধ করছিলেন।

তারপরও সে যাবে। বললো, স্যারের বেতন দিয়েই চলে আসবো।

যাহোক, স্যারের বাসায় শর্টকাট যেতে গিয়ে ধূপখোলা মাঠ দিয়ে পার হচ্ছিল। এমন সময় একজন ছিনতাইকারী তাকে ধরে। ক্ষুর বের করে জিজ্ঞাসা করে, কি আছে?

সে বলে, পকেটে পাচশ টাকা স্যারের বেতন আছে। আর কিছু নেই।

ছিনতাইকারী প্রথমে পাচশ টাকা নেয় এবং চোখ থেকে চশমা খুলে দিতে বলে।

তুষার কিছুতেই এটা দেবে না। কারণ তার ফেভারিট চশমা।

লোকটা জোরাজুরি করছিল। এক পর্যায়ে তুষারের হাতের কব্জিতে ক্ষুর দিয়ে কোপ দেয় এবং চশমাটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

আশপাশে কেউ ছিল না। তাই সে কোনোমতে দৌড়ে স্যারের বাসায় যায়, এবং তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

প্রথমে ডাক্তার ভেবেছিল হাতের দুটো রগ কেটে গেছে। কিন্তু অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে দেখে তার হাতের পাচটা রগই কেটে গেছে। অনেক বড় অপারেশন হয়েছে। এখন তার বাম হাতটার দিকে তাকালে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। এবং সেসব ছিনতাইকারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করি যারা তার হাতটা নষ্ট করে দিয়েছে।

তুষার এখন আর দামি ফ্রেমের চশমা পরে না। যদিও সে অনেকগুলো দামি ফ্রেম গিফট পেয়েছে এবং অতি যত্নে রেখে দিয়েছে। তাই সবাইকে বলি, ফেভারিট জিনিসের জন্যে কখনো নিজের এতো বড় ক্ষতি করবেন না। কারণ জিনিসের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি যা আমার ছোট ভাইকে দেখে বুঝতে পারছি।

নারিন্দা, ঢাকা থেকে

শিক্ষা

– মোহাম্মদ ফয়সাল

ঘটনাটা সেই ১৯৯৫ সালের। কিন্তু এ লেখাটা যখন লিখছিলাম তখন আমার হাত চলছিল না। খুব কষ্ট করে শেষ করি। ঢাকার উত্তর বাড্ডায় একটি হাফেজি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করি তখন। আমরা একটি মসজিদের দোতলায় ক্লাস করতাম। মসজিদের ভেতরের প্রাচীরগুলো ছিল শাদা ধবধবে। আমরা যেখানে বসতাম তার সামনের দেয়ালে কে বা কারা কাচা আমের বিচি দিয়ে *চশমা* শব্দটি লিখে রেখেছে। আমরা ব্যাপারটি নিয়ে এতো ভাবিনি। একদিন হুজুরদের চোখে পড়লো।

প্রতিদিনের, মতো সেদিনও ক্লাস শেষ হলো। আমরা চলে যেতেই সবাইকে বসতে বললো। কারণটা বুঝতে পারলাম না। দেখলাম একটা ব্ল্যাকবোর্ড আনা হলো এবং সঙ্গে চক। বুঝলাম হাতের লেখা সুন্দর কার পরীক্ষা করবে। একে একে সবাইকে চশমা শব্দটি লিখতে বললো।

আমার পালা এলো। আমাকে লিখতে বলা হলো। আমার একটা চশমা আছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী চশমা পরেন, ইত্যাদি লেখা।

আমার লেখা থামিয়ে দিয়ে বললেন, পেয়েছি। আমাকে সবার সামনে হুজুর বললেন, দেয়ালে চশমা কে লিখেছে?

বললাম, আমি জানি না এবং লিখিনি।

এভাবে আমাকে অনেক চাপ প্রয়োগ করা হলো।

আমি প্রতিবার না সূচক জবাব দিলাম।

প্রথমজন ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় হুজুর আমাকে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে বের করতে চাইলেন।

কিন্তু আমার উত্তর একটাই, না।

শেষে তিনি কৌশল বদলিয়ে আমাকে বললেন, তোমার লেখার সঙ্গে বোর্ডে লেখার মিল আছে। তুমি এখনো বলো। তোমাকে কিছুই বলা হবে না, মারবো না।

একটু চিন্তা করলাম। আমি যেহেতু লিখিনি এবং হুজুর বললেন মারবে না তখন স্বীকার করি – যে লিখেছে সে বেচে যাবে, ঝামেলাও শেষ হবে। আমি হ্যা সূচক জবাব দিলাম।

হ্যা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বেত্রাঘাত করতে লাগলেন। আমি হুজুরের কথা ও কাজের মিল পেলাম না। তার যতোক্ষণ ইচ্ছা হলো ততোক্ষণ তিনি মারলেন। সব কিছুর যেমন শেষ আছে তেমনি আমার মারেরও ইতি টানলেন।

নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম এই বলে, অন্যের দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে। ক্লান্ত দেহে উপরে উঠলাম, রান্নাঘরে দেখি আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে। ঘটনার সময় সে উপস্থিত ছিল না। তাই তাকে সন্দেহ হলো। কাছে গিয়ে বললাম, দেখ ভাই, আমি দেয়ালে চশমা লিখিনি, অথচ স্বীকার করে প্রচণ্ড মার খেলাম। যে লিখেছে সে খুব সুখে আছে। তাই না?

দেখি সে মিটি মিটি হাসছে।

আমার সন্দেহ আরো দৃঢ় হলো। বললাম, ভাই মার খেয়েছি, লেখা মুছে ফেলেছি আর কিছুই হবে না। তুমি যদি লিখে থাকো তাহলে আমাকে বলো।

উত্তর এলো, হ্যা।

আমি এক বড় ভাইকে ডেকে তাকেও শোনালাম। বড় ভাই ছেলেটিকে ধরে হুজুরের কাছে নিয়ে গেলেন এবং ঘটনা বললেন।

হুজুরে আর দেরি সইলো না। মারতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, নিরীহ ছেলেটাকে মার খাওয়ালি।

পাশেই দাড়িয়েছিলাম। আমার এতো পিটুনি সহ্য হচ্ছিল না। তাই হুজুরকে অনুরোধ করলাম, তাকে মারবেন না।

আমার কথামতো আর পিটুনি দেননি। পরে আমাকে কাছে ডেকে হুজুর বললেন, তোমাকে অন্যায়ভাবে মেরেছি। আমার ব্যথার স্থানে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমাকে যদি কেউ বলে, তুমি অন্যায় করেছো অথচ তুমি তা করোনি, তখন তোমাকে মেরে ফেলা হলেও স্বীকার করবে না।

আমি প্রচণ্ড আঘাত পেলেও একটি শিক্ষা অর্জন করেছি, এটাই আমার বড় পাওয়া। হয়তো সে দাগগুলো মুছে গেছে। কিন্তু সে শিক্ষাটা আজও ভুলিনি। হয়তো কোনোদিন ভুলতেও পারবো না।

গগন, বরিশাল থেকে

মিথিলা

– এ.এম আশরাফ

সেই ১৯৯৫ সালের কথা। আমাদের পাশের পাড়ার একটি মেয়ে, দেখতে বেশ সুন্দরী। তার ওপর সানগ্লাস পরলে ভাবতে অবাক লাগতো, সে কি ফটো সুন্দরী, নাকি সাধারণ একটি মেয়ে! তার বেশ কিছুদিন পর জানতে পারলাম সেই মেয়েটি আমার অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। আমাদের চার চোখের দেখা হলো এক আত্মীয়ার বিয়েতে।

গভীর রাত, সবাই গায়ে হলুদ নিয়ে ব্যস্ত। আমি অবলা সেই অনেক দিনের মনের মানুষটির সন্ধানে স্টেজের এক কোণে বসে শুধু এদিক–ওদিক তাকাচ্ছি। হঠাৎ নজরে পড়লো সে আরেক কোণে খামোশ হয়ে বসে আছে। ভাবলাম কিভাবে তার সঙ্গে কথা বলা যায়। একটা উপায় ঠিক করলাম। চালাকি করে আমার মামাতো ভাবীর সাহায্য নিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করে নিলাম।

বেশ লাজুকভাবে বললো, কেমন আছেন?

বললাম, কেমন আছি তা ভাবীর থেকে জেনে নিও। কথাটি বলে চলে গেলাম।

জানি না ভাবী তাকে কি বলেছেন পরে। বিয়ের দিন সবাই সুন্দর কাপড় পরার চেষ্টা করে, আমিও তাই করলাম। বারোটায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হই। অমনি মেয়েটি হাসতে হাসতে সামনে এসে বললো, গত রাত কেমন কাটলো?

বললাম, সুন্দর একটি মেয়ে স্বপ্নে অনেক দুষ্টামি করেছে, তাই ঠিকমতো আরাম করতে পারিনি।

সে বললো, মেয়েটিকে বলে দেবেন স্বপ্নে না এসে যে, বাস্তবে এসে দাড়ায়।

বললাম, যদি তোমাকে কেউ এ রকম কথা বলে তুমি কি বাস্তবে দাড়াবার ক্ষমতা রাখো?

মেয়েটি লাজুক চোখে বললো, চেষ্টা করে দেখবো।

বললাম, ও হে তোমার সানগ্লাসটি নিয়ে আসোনি?

মেয়েটি অবাক হয়ে বললো, ওহ মাই গড! আপনি আমাকে আগে থেকে চেনেন?

বললাম, চেনার সাহস তো পাইনি। তবে দূর থেকে অনেকবার তোমাকে দেখেছি।

মেয়েটি লজ্জায় আর কিছু বলার সাহস পায় না। বললো এখন আসি আবার সুযোগ পেলে কথা হবে।

তারপর বিয়ের অনুষ্ঠানে সবাইকে ফাকি দিয়ে অনুষ্ঠানের মাঝে মধ্যে অনেক ভঙ্গি দেখাতো। আমিও অনেক কিছু ইশারায় বলে দিলাম।

এবার আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার ঘণ্টি পড়লো। এমন সময় শুধু তাকে খুজছি আমার অনেক দিনের মনের কথাটা তাকে খুলে বলার জন্য। অনেক কষ্টে তাকে খুজে বের করলাম। এবার বললাম, চলে যাচ্ছি। তবে জেনে রেখো, গতরাতে স্বপ্নে ডিস্টার্ব করা মেয়েটি এখন আমার সামনে দাড়িয়ে আছে।

সে হেসে বললো, যদি বলি আমারও তাই। কথাটি বলে আবার বললো, পারলে বাসায় আসবেন।

তারপর বিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসি। তার বেশ কিছুদিন পর তার কলেজে যাই একটু দেখবো বলে। তাকে মিথিলা বলে ডাকতাম। তারপর আস্তে আস্তে আমাদের দুজনের সম্পর্ক আরো অনেক গভীরে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত এমন হলো তাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝতাম না। তারপর একদিন তাকে প্রশ্ন করলাম, কি হলো মিথিলা, আগে অনেক বেশি সাজ-গোজ করতে এবং সানগ্লাস লাগাতে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর কখনো সেই সানগ্লাস লাগাতে দেখিনি।

মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বললো, বড় ভয় হয়, এই সানগ্লাস পরে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল যদি আবার পরলে তার বিপরীত হয়। তাই যত্ন করে রেখে দিয়েছি। যদি কোনোদিন তোমার বৌ হয়ে যেতে পারি তাহলে আবার সেই সানগ্লাসটি পরবো।

জানি না মিথিলা, তুমি আজও কি সেই কথাটি মনে রেখেছো? বড় জানতে ইচ্ছে করে। আজও আমি এই সানগ্লাসটির কথা ভুলতে পারিনি সেই সাত সমুদ্র তেরো নদী দূর থেকেও।

ইটালি থেকে

লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড

– ড. কায়সার মামুন

সিংগাপুর এসে একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো। মুসলমানরা যদিও জনসংখ্যার মাত্র শতকরা আঠারো ভাগ তবুও এদের এভাবে সব জায়গায় চোখে পড়ে। ম্যাকডোনাল্ডস, কেএফসি-র মতো সব আমেরিকান ফাস্ট ফুডের চেইনে হালাল খাবার বিক্রি হয়। গরমের স্কুল হলিডে-তে এ দেশের লোক যখন বেড়াতে যায়, মুসলমানরা তখন চেষ্টা করেন পরিবারসহ ওমরাহ করতে। এখানকার বেশ কিছু ট্রাভেল এজেন্ট শুধু ওমরাহ ও হজের ব্যবসা করেন। মানুষকে আন্তরিক সেবা দিয়ে তারা অর্থ ও দোয়া দুটোই পাচ্ছেন।

২০০১ সালে সিংগাপুর এসেই সিদ্ধান্ত নিলাম ওমরাহ করতে যাবো। পুরো প্ল্যান ঠিক করে টাকা জমা দেয়ার পর নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলা হলো।

আমার অমুসলিম সহকর্মীরা বললেন, আমার যাত্রা বাতিল করতে। কিন্তু আল্লাহর ঘরে যাবার নিয়ত করে এই সামান্য কারণে কি আর সেটা বাতিল করা যায়!

ওমরাহর প্রথম পর্বে আমরা মদিনা গেলাম, মহানবীর রওজা শরিফ জিয়ারত করে আমরা মক্কা এলাম।

সেপ্টেম্বর মাসে মক্কায় প্রচণ্ড গরম। দিনেরবেলা তাপমাত্রা থাকে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রচণ্ড লু হাওয়া বয়। প্রথম ওমরাহ শেষ করে ভাবলাম, আমার প্রয়াত বাবার নামে ওমরাহ করবো, ওমরাহ নিয়ত করার জন্য মক্কা শহরের প্রান্তে আয়েশা মসজিদে এলাম। এখান থেকেই হযরত আয়েশা (রা.) ওমরাহর নিয়ত করেছিলেন। এখান থেকে নিয়ত করে বাসে হারাম শরিফে ফিরে *তাওয়াফ* শুরু করলাম।

তিন তাওয়াফ শেষ হবার পরেই হঠাৎ নামলো প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে মেঘের গর্জন। প্রিয় বাংলাদেশের আষাঢ় মাসের মতো অবস্থা। আমরা সবাই খুশি হলাম আল্লাহর এই অশেষ করুণায়। বৃষ্টির মধ্যেই তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহিমে দুই রাকাত নামাজ পড়লাম। জমজমের পানি পান করে তৈরি হলাম সাফা–মারওয়ার মাঝে সাই করার জন্য। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আমার চশমার কাচ ঝাপসা হয়েছে। তাই চশমা খুলে আমার কাধব্যাগে রাখলাম।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাই করার জায়গাটুকু এখন সম্পূর্ণ এয়ার কনডিশন্ড। পুরো জায়গাটুকু হারাম এলাকার মতো মসৃণ শাদা পাথর দিয়ে ঢাকা। প্রচণ্ড গরমেও এই পাথর ঠাণ্ডা থাকে। সাফা ও মারওয়া–র মাঝখানের পথের কিছু অংশে সবুজ বাতি দেয়া আছে। এই জায়গাটুকু পুরুষদের কিছুটা দৌড়ে পার হতে হয়। বৃষ্টির প্রচণ্ড ঝাপটা এসে পড়ছিল। বেশ কিছু ক্লিনার চেষ্টা করছিলেন পথের পানি পরিষ্কার করতে।

যাহোক, সাফা পাহাড় থেকে সাই করা শুরু করলাম। সবুজ বাতি দেয়া অংশে এসে আমার সামনের এক বয়স্ক ভদ্রলোক পিছলে পড়ে গেলেন। তাকে ধরতে গিয়ে আমিও পড়ে গেলাম। তবে কারোরই বেশি ব্যথা লাগেনি। বাকি পথটুকু সাবধানে পর হয়ে সাতবার সাই করলাম। এরপর চুল কেটে ওমরাহ করণীয় শেষ হলো। এখন হোটেলে ফেরার পালা।

আমি বহুদিন যাবৎ মায়োপিয়াতে ভুগছি। চশমা ছাড়া দূরের জিনিস ভালো দেখতে পাই না। আমার ব্যাগে হাত দিলাম চশমার জন্য। কিন্তু কোথায় চশমা? আমার ছোট ব্যাগটি তন্ন তন্ন করে খুজলাম, কোথাও নেই। পরে আছি দুই টুকরা সেলাই বিহীন কাপড়, এতে কোনো পকেট নেই যে, চশমা খুলে রেখে দেবো। পরিষ্কার মনে আছে, চশমা ব্যাগেই রেখেছি।

ধীরে ধীরে হেটে মাওয়া থেকে আবার সাফা পাহাড়ে এলাম। লক্ষ্য রাখছি পথে কোথাও আমার প্রিয় চশমাটি পড়ে আছে কি না। কিন্ত পুরো পথটাই পরিষ্কার, আমার চশমার কোনো চিহ্ন নেই।

উন্নত দেশে ট্রেন স্টেশন, এয়ারপোর্ট, বড় শপিং মল ইত্যাদিতে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বা লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড (হারানো–প্রাপ্তি) অফিস থাকে। কারো কিছু হারালে এখানে খবর দিতে হয়। কেউ কিছু খুজে পেলেও এখানে জমা দিয়ে যায় যাতে হারানো জিনিস মালিক ফিরে পেতে পারে। হারাম শরিফের ভেতর বেশ কিছু পুলিশ থাকে। তাদের গিয়ে বললাম, আমার চশমা হারানোর কথা। জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম কোনো লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড আছে কি না। কিন্তু এরা আরবি ছাড়া কিছুই বোঝে না, তাই কোনো সুবিধা হলো না।

যাহোক, ধীরে ধীরে আমার হোটেলে ফিরে এলাম। আমি থেকেছি *হোয়াইট প্যালেস* হোটেলে। এটার ম্যানেজার ও রুম এটেনডেন্ট সবাই বাংলাদেশি, খুবই আমায়িক লোক। বহু বছর ধরে সউদি আরবে আছেন।

সবাইকে চশমা হারানোর কথা বললাম। কিন্তু কেউ বলতে পারলেন না কিভাবে হারানো জিনিস খুজে পাওয়া যেতে পারে।

সাধারণত লম্বা সফরে বের হলে অতিরিক্ত এক জোড়া চশমা সঙ্গে রাখি। কিন্তু এবারেই সেটা করা হয়নি। ভাবলাম সন্ধ্যায় সিংগাপুরে ফোন করে গিন্নিকে বলবো, আমার চশমার প্রেসকৃপশন হোটেলে ফ্যাক্স করে দিতে।

আসরের নামাজের আজান হলে আবার হারাম শরিফ গেলাম। নামাজ পড়ে বের হবার সময় দেখলাম একজন বয়স্ক পুলিশ এক পাশে দাড়িয়ে আছে। কাধে তিন তারা লাগানো ব্যাজ। ভাবলাম এই লোক নিশ্চয় ইংরেজি বুঝবেন। সালাম দিয়ে ইংরেজিতে বললাম, আমার চশমা হারিয়েছে, কোনো লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড অফিস আছে কি না?

ভদ্রলোক বুঝতে একটু সময় নিলেন। তারপরেই দরাজ হাসি দিয়ে বললেন, *ওহ! মাফকুদাত!*

আমাকে হাত ধরে বাদশা আবদুল আজিজ গেটের কাছে নিয়ে বললেন বাম দিকে যেতে। সেখানে অফিস আছে, কাউন্টারে গিয়ে কথা বলতে।

কিছুটা এগোতেই দেখি হারাম শরিফের সঙ্গে ছোট একটা অফিস। বেশ বড় আরবি সাইনবোর্ড, নিচে ছোট করে ইংরেজিতে লেখা লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড (হারানো–প্রাপ্তি)।

কাউন্টারে গিয়ে বললাম আমার চশমা হারানোর কথা।

কথা শুনে কাউন্টারের লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, কবে হারিয়েছে। তারপর পাশের কাউন্টারে যেতে বলে সহকর্মীকে ঝড়ের গতিতে আরবিতে কিছু বললেন।

ভাবলাম এবার হয়তো একগাদা আরবি ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড!

পাশের কাউন্টারে ট্রে ভর্তি চশমা এনে হাজির করলেন। মুচকি হেসে বললেন, কোনটা আপনার?

শখানেক নানান রঙের, নানান ডিজাইনের চশমা। তবে সবচেয়ে উপরে রাখা আমার চশমাটি। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে চশমা চোখে হোটেলে ফিরলাম। পরিচিত সবাইকে জানালাম মাফকুদাত সম্পর্কে। ভবিষ্যতে কারো কিছু হারালে যাতে ওখানে গিয়ে খবর নিতে পারেন।

সিংগাপুর থেকে

টয়লেট ক্লিনার

– অনির্বাণ রায়

বাড়ি ঢাকার বাইরে। সঙ্গত কারণে মেসে জীবন যাপন করতে হয়। একটি বেসরকারি ইউনির্ভাসিটিতে কমপিউটার সায়েন্সে পড়ছি। আমাদের সিলেবাসে রয়েছে অংকের বাড়াবাড়ি রকমের আনাগোনা। আমি বুঝি না, এই অংক আমাদের কোথায় কাজে লাগবে। আর এ অংকেই আমি প্রচণ্ড রকম দুর্বল।

সামনে অংক ফাইনাল পরীক্ষা। চোখে শর্ষের ফুল দেখছি। সকাল দশটায় পরীক্ষা আরম্ভ।

নয়টায় গোসলের উদ্দেশ্যে চশমা পরেই টয়লেটে গেলাম। চশমাটা রাখলাম টয়লেটের ওপরে কাপড় রাখার দড়িতে, সঙ্গে কাপড়গুলোও রাখলাম। গোসল পর্ব শেষ করে যেই গামছা টানবো তখনই আমার মাইনাস 3.50–এর চশমাটা পড়ে যায় কমোডে। একেবারে ভেতরে। কি হবে এখন! সকাল দশটায় পরীক্ষা।

চিন্তায় গোসল করা অবস্থায় ঘাম শুরু হলো। হাত ঢোকালাম শেষ পর্যন্ত। উহ! কি বিশ্রী রকমের অভিজ্ঞতা। অংক করে কি টয়লেট ক্লিনার হবো?

বনানী, ঢাকা থেকে

anirban214s@yahoo.com

জাপানিজ

– শাহ মতিউর রহমান

আমার চশমা পরার প্রথম অভিজ্ঞতা হয় ১৯৭৬ সালে। বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়। আমার সরকারি চাকরির কর্মস্থল ছিল ঢাকা জেলা সদরে। সে সময় স্থানীয় সরকার বিষয়ক এক ট্রেনিং কোর্সে যোগদানের জন্য জাপানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। অফিসে তখন দারুণ কাজের চাপ। প্রায়ই মাথা ধরতো। লেখাপড়ার কাজ একটু বেশি করলেই কপাল টন টন করতো। চোখে ব্যথা অনুভব করতাম। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই কয়েকদিন অফিসে ব্যথার ট্যাবলেট গ্লাসে গুলিয়ে খাই। কিন্তু তাতে তেমন ফল হয়নি। একটু বেশিক্ষণ ধরে অফিসের ফাইল পড়া–লেখা করলে মাথা ব্যথা বেড়ে যেতো, চোখে ঝাপসা দেখতাম।

একদিন অফিসের এ.ও সাহেবের কাছে আমার সমস্যার কথা প্রকাশ করলে তিনি আমাকে জাপান যাওয়ার আগে একবার চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

চোখের ডাক্তারের কাছে আজ যাবো, কাল যাবো করে দুই সপ্তাহ পেরিয়ে যায়। এদিকে আমার জাপান যাত্রার সময়ও ঘনিয়ে আসে।

এ সময় একদিন কি কাজে যেন সচিবালয়ে ঢুকেছিলাম। সেখানে জাপান ফেরত আমার পরিচিত এক সিনিয়র সহকর্মীর সাক্ষাৎ পাই।

আমার জাপান যাত্রার কথা উঠলে তিনি আমাকে সে দেশের টুকিটাকি বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। বলেন, জাপানে চোখের ডাক্তারের ভিজিট অনেক বেশি। চশমার দাম আরো বেশি। তোমার চোখের কোনো সমস্যা থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে ঢাকা থেকে চশমা নিয়ে যাবে। না হলে সেখানে কয়েক হাজার ইয়েন গচ্চা দিতে হবে।

আমি সেদিনই বিকেলে সে সময়ের প্রখ্যাত চোখ বিশেষজ্ঞ ডা. ওয়াদুদের ধানমন্ডিস্থ চেম্বারে যাই। দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমার ডাক পড়ে। লাইট অফ করে অন্ধকার রুমে অনেকক্ষণ ধরে বিশেষ ধরনের টর্চ দিয়ে তিনি আমার চোখ পরীক্ষা করেন। খালি ফ্রেমে বিভিন্ন পাওয়ারের লেন্স এক এক করে লাগিয়ে দূরের ও কাছের লেখা পড়তে বলেন। অতঃপর চশমার ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। চশমার পাওয়ার সম্ভবত +.৫০ ছিল। কেবল পড়ার জন্য হলেও ডাক্তার সব সময় চশমা পরার পরামর্শ দেন।

ওই দিনই নিউ মার্কেটে এক চশমার দোকানে গিয়ে চশমার অর্ডার দিই। অনেকক্ষণ ধরে নানান আকৃতির ফ্রেম দেখে একটি পছন্দ করি। সেটি ছিল অনেকটা বঙ্গবন্ধুর ফ্রেমের মতো। তবে অতো মোটা নয়।

পরের দিন বাসায় এসে চশমা পরে বড় আয়নার সামনে দাড়াই। মাথা এদিক–ওদিক করি। বাসার সবাইকে বলি, আমাকে চশমা পরে কেমন লাগছে? আমার স্ত্রী তার চিরাচরিত অভ্যাস মতো বলতে থাকে, এর চেয়ে ভালো ফ্রেম ছিল না?

চশমা পরে পড়ালেখা করতে প্রথম কয়েকদিন অস্বস্তি বোধ করতাম। অনেক সময় চশমা পরার কথা মনেই থাকতো না। কখনো বা অফিসে চশমা রেখে বাসায় ফিরতাম। রাতে খবরের কাগজ বা অন্য কিছু পড়তে গিয়ে মনে পড়তো, আরে, চশমাটা তো অফিসে রেখে এসেছি।

স্ত্রী ধমকের সুরে বলতো, তুমি আজকাল বড় মনভোলা হয়েছো।

এক সপ্তাহ পর নতুন চশমা পরে জাপানে রওনা হই। অনেক রাতে টোকিও পৌছি। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাকসি যোগে আগের নির্ধারিত আবাসস্থল ইচিগয়া আন্তর্জাতিক সেন্টারে পৌছাতে রাত দুটো বাজে। সেখানে চেনা–অচেনা বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি কর্মকর্তাকে দেখতে পাই।

জাপান পৌছার কয়েকদিন পর আমার সেই চোখ ব্যথা আর কপাল টন টন করা আবার শুরু হয়। পরিচিতদের আমার চোখের সমস্যার কথা জানালে তারা টেনিং নিতে আসা বিদেশি কর্মকর্তাদের ফৃ চিকিৎসা সেবার নির্দিষ্ট মেডিকাল সেন্টারে আমাকে যেতে বলেন। তাদের কাছ থেকে জানতে পারি, ফৃ সার্ভিস মেডিকাল সেন্টারে সব রকমের অসুখের জন্য সবাইকে নাকি একই রকমের *পুরিয়া* ওষুধ দেয়া হয়।

তাদের পরামর্শ মতো সন্ধ্যায় কাছের ওই মেডিকাল সেন্টারে গিয়ে কর্তব্যরত ব্যক্তিকে আমার পরিচয় দিয়ে চোখের সমস্যার কথা বলি। তিনি আমাকে এক মহিলা ডাক্তারের রুমে রেখে আসেন।

মহিলাটি একজন চোখের ডাক্তার। হালকা–পাতলা চেহারা, বয়স বোঝা মুশকিল। তিনি আমার পরিচয় কার্ডটি চেয়ে নিয়ে তার রেজিস্টারে আমার নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। তারপর টেলিস্কোপের মতো একটা লম্বা যন্ত্র দিয়ে আমার চোখ দুটি ভালো করে দেখে বলেন, নো প্রোবলেম।

আমার চশমার লেন্স পরীক্ষা করে জানতে চান, কোন দেশের ডাক্তার আমার চশমার পাওয়ার ঠিক করে দিয়েছেন।

বলি, বাংলাদেশের।

ডাক্তার মহিলাটি বলেন, চশমার পাওয়ার সঠিক। ইওর ডক্টর গেভ ইউ দি রাইট গ্লাস। তারপর আগের তৈরি করে রাখা কয়েকটি ওষুধের পুরিয়া আমার হাতে দিয়ে বলেন, এই ওষুধগুলো নাও এবং তোমার চোখকে কম ব্যবহার করো।

তার কথার পরের অংশটি ঠিক বুঝতে না পেরে বলি, আই কান্ট ফলো, হোয়াইট ডু ইউ মিন?

ডাক্তার মহিলাটি হেসে বলেন, কম সংখ্যক খেয়ে দেখো।

তার রসিকতা উপলব্ধি করতে পেরে আমিও হেসে বললাম, তোমাকে আর দেখছি না। আমি চোখ বন্ধ করছি।

সে তখন আরো জোরে হাসতে থাকে। তারপর জাপানি কায়দায় *সায়নারা* বলে তার রুম থেকে বেরিয়ে আসি।

জাপানি মহিলা ডাক্তারের দেয়া সেই পুরিয়া ওষুধ খেয়ে পরে আর চোখে ব্যথা বোধ করিনি।

ঢাকা থেকে

আনন্দের চিরকুট

– সুমনা ফাহমিদা

এক. তখন ক্লাস সেভেন কি এইটে পড়ি। দূরের সব কিছু ঝাপসা লাগে। তাই আব্বা চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার আমাকে চশমা দিলেন -0.5। আমি খুব খুশি হলাম। এখন থেকে চশমা পরবো।

চশমার দোকানে গিয়ে ফ্রেম পছন্দ করলাম এবং আব্বা চশমা বানাতে দিলেন। দুদিন পর চশমা পাওয়া যাবে। যেদিন চশমা দেবে সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে এসে দেখি, আব্বা চশমার দোকান থেকে বাসায় এসে আবার বাইরে গেছেন। আম্মাকে বললাম, আমার চশমা কোথায়?

তখন আমার ভাইয়া আমাকে একটা খাম দিলেন।

খামটি খুলে দেখি আব্বার হাতের লেখা একটি চিরকুট। তাতে লেখা আছে, আমার টেবিলের ড্রয়ারে চশমাটা আছে। দৌড়ে গিয়ে আব্বার টেবিলের ড্রয়ার খুললাম। কিন্তু চশমা নেই। সেখানে আরেকটা চিরকুট আছে। সেটাতে লেখা, আমাদের কালো ছাতাটা খুলে দেখো। আমি ছাতাটা মেঝেতে রেখে খুব সাবধানে খুললাম

যদি চশমা পড়ে যায়! এখানেও চশমা নেই। কিন্তু ছাতার রডের সঙ্গে আরেকটা চিরকুট দেখি। এতে লেখা আছে, স্টোররুমের ড্রামের মধ্যে দেখো তো চশমাটা আছে নাকি?

স্টোররুমে ড্রামের ঢাকনা খুলে দেখি, একটা নতুন চশমার খাপ এবং তার ভেতর আমার চশমা। আমি চশমা চোখে দিই এবং সব কিছু স্পষ্ট দেখতে থাকি।

দুই. -0.5 পাওয়ারের চশমা এখন -5.5। চশমা ছাড়া চলাফেরায় অসুবিধা হয়। প্রথম দিকে ছয় মাস পর পর চশমার পাওয়ার বাড়তো। এখন আর বাড়ে না। যাই হোক। দ্বিতীয় ঘটনায় আসি। আমার বিয়ের সময়ের ঘটনা। আমি ছিলাম চশমা পরা বৌ। চশমা পরে স্টেজে বসেছিলাম। তবে ভিডিওম্যানের অনুরোধে মাঝে মধ্যে চশমা খুলতে হতো। কারণ ভিডিও-এর লাইট চশমায় রিফ্লেক্ট করে। ফলে কিছু স্টিল ছবি চশমা ছাড়া ছিল।

আমার বিয়ের ম্যাচমেকার ছিলেন ভাইয়ার বন্ধু, সোহেলভাইয়া। বিয়ের পরে সোহেলভাইয়া আমার বিয়ের ছবিগুলো দেখছিল। হঠাৎ চশমা ছাড়া আমার ছবি দেখে বলেন, এ কে? এটা কার বিয়ে?

আমরা সবাই হাসছিলাম। ম্যাচমেকার বিয়ের কনেকে চেনে না। অবশ্য সোহেলভাইয়াকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ চশমা ছাড়া আসলেই আমাকে অন্য রকম লাগে।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

প্রতিশোধ

– শাহাদাত সবুজ

এক.

তখন ক্লাস টেন-এ পড়ি। ক্লাস নাইন-এ পড়তো মুন্নি নামের একটি মেয়ে। সুন্দরী হওয়াতে তাকে চিনতাম। উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পর্ক ছিল না। একদিন দেখলাম, স্কুলে মুন্নি চশমা পরে এসেছে। তারপর থেকে নিয়মিত। জানলাম শখ করে নয়, চোখের অসুবিধার জন্য ডাক্তারি পরামর্শে চশমা ব্যবহার করা।

কিছুদিনের ভেতর তার নাম হয়ে গেল *চশমা বেগম*। চশমা বেগম শব্দটির সঠিক আবিষ্কারক কে তার হদিস মেলেনি। চশমা বেগম বলে অনায়াসে ক্ষ্যাপানো যেতো মুন্নিকে। সে সুযোগটি লুফে নিলাম আমরা।

মিস চশমা বেগম ডেকে তাকে ক্ষেপিয়ে তুললাম। মুন্নি রেগে গিয়ে কটমট চোখে তাকাতো। তার তাকানোর এই স্টাইল এক রকম মুগ্ধ করে দিল আমাকে। ফলে তাকে ক্ষেপানোর লোভ আরো বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শুধু আমার নামে মুন্নি হেড মাস্টারের কাছে নালিশ পৌছালো।

হেড মাস্টারের তলবে পড়লাম।

কেন এই তলব? তখনি বুঝতে পারি। কেননা মুন্নি হেড মাস্টারের কাছে নালিশ দেয়ার হুমকি দিয়েছিল। ঢিপ ঢিপ করা বুকে হেড স্যারের সামনে দাড়ালাম।

স্যার বড় জেদি, একরোখা। ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি দিতে তিনি খুব পরিপক্ব।

মেয়েলি কোনো কেসে পড়লে স্যারের কাছ থেকে রক্ষা পাবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। অবশেষে স্যার আমাকে অবাক করে, বেত্রাঘাত বাদ দিয়ে মানসিক শাস্তিতে মামলা ডিসমিস করে দিলেন। স্যারের অনেক কথার উল্লেখযোগ্য কথা ছিল, বড় হয়ে ছোট বোনদের সঙ্গে ফাজলামি করতে লজ্জা লাগে না?

মুন্নির নালিশ কাজে লাগলো বটে। সেই থেকে মুন্নির সামনে মিস চশমা বেগম উচ্চারণ করা থেকে নিজেকে সংযত রাখলাম।

দুঃখজনক হলেও সত্য, মাস খানেকের মধ্যে বাল্যবিয়ের কবলে পড়ে গেল মুন্নি। তার জন্য খুব দুঃখ হলো। নিজেও কেমন জানি হারানোর তীব্র এক শূন্যতা হৃদয়ে অনুভব করলাম। তার প্রতি বাড়তি এক ধরনের দুর্বলতা ছিল বৈকি আমার!

দুই.

স্কুলের গণ্ডি পার হলে দুর্ভাগ্যক্রমে চশমা আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। ডাক্তারি ট্রিটমেন্টে চশমা ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়ালো।

প্রায় মাস চারেক আগের কথা। আমাদের থানা বাজারের একটি নামকরা মার্কেটে গেঞ্জি কিনতে গেলাম। এক দোকানে গিয়ে দেখি দুজন বোরখা পরা মহিলা কাস্টমার।

কাস্টমার হিসেবে আমিও দোকানে ঢুকলাম। তাদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দোকানদারকে গেঞ্জি দেখাতে বললাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, চোখে চশমা লাগানো বোরখা পরা একজন আমার দিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকিয়ে কি যেন খুজছে? এভাবে তাকানোর কোনো মানে খুজে পেলাম না!

এক পর্যায়ে আমার একটু সামনে এসে বললো, *মিস্টার চশমা উদ্দিন* কেমন আছেন?

মনে মনে চমকে উঠলাম। চশমা ব্যবহার করার পর থেকে এমন উপাধি কেউ দেয়নি। আজকেই প্রথম! বিব্রত বোধ করে বললাম, আপনি?

সে বললো, চিনতে পারছেন না?

বললাম, ইয়ে, মানে, না তো?

সে বললো, স্কুল জীবনে কিন্তু খুব চিনতেন।

চুপ করে ঠোট কামড়ে স্মৃতি শক্তিকে জোরে জোরে ঘাটলাম। মুহূর্তে যে তথ্য আসে তার ওপর নির্ভর করে বললাম, আপনি কি মুন্নি?

চিনেছেন বটে!

পুরনো সেই দুর্বলতার ঢেউ নতুন করে উথলে ওঠে হৃদয়ে। স্মিত হাসি টেনে বললাম, কতোদিন পর দেখা! তাই না? কেমন আছেন?

মুন্নি জবাব দিল, জি, আল্লাহর রহমতে ভালো।

হাজব্যান্ড কোথায়?

আপাতত বিদেশে।

সঙ্গের উনি কে?

আমার চাচাতো ননদ।

ছেলেমেয়ে?

এক এক করে দুজন। সঙ্গে আনিনি।

স্কুলের কথা কি মনে পড়ে?

তা কি ভোলা সম্ভব?

হ্যা, মানুষের জীবনে কিছু কিছু অতীত থাকে যা ভোলা সম্ভব নয়।

আপনি এখন কি করেন?

পড়ালেখাতেই আছি। আচ্ছা, আমাকে মিস্টার চশমা উদ্দিন ডেকে কি পুরনো প্রতিশোধ নিলেন?

মুন্নি একটু হেসে বললো, সুযোগ যখন পেয়েছি হাতছাড়া করি কি করে?

আমি হাসলাম।

মুন্নি এবার বললো, মাইন্ড করলেন?
বলে উঠলাম, না, না মাইন্ড করবো কেন? বলেই দুজন হেসে উঠলাম।
দুর্ভাগ্য। বোরখার নেকাবের কারণে জীবনের প্রথম ভালো লাগার মানুষটির হাসি তো বটেই, চেহারা দেখা থেকেও বঞ্চিত হলাম।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে

মতবিরোধ

– খন্দকার নাজমুল

দিনটি ছিল শুক্রবার। সাংসারিক কাজে বাইরে থেকে অনেক ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে মায়ের কাছে বসলাম। এ সময় আমার মা চালের ময়লা পরিষ্কার করছিলেন। চালের ময়লা পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ বললেন, যতোই দিন যাচ্ছে ততোই চোখে ঝাপসা দেখছি। একমাত্র আল্লাহই জানে, চোখের জ্যোতি চিরদিনের জন্য কখন কেড়ে নেন।
মায়ের মুখে এ কথা শুনে নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হচ্ছিল। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, যে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, অনেক কষ্ট করে, লালন-পালন করেছেন সেই মায়ের শারীরিক সমস্যার কথা কেন নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম না। মাকে একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললাম, আজ শুক্রবার। হাসপাতাল বন্ধ। কাল তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।
শনিবার মাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার চোখের যাবতীয় পরীক্ষা শেষ করে মাকে চশমা ব্যবহার করতে বললেন। ডাক্তারের কথামতো চোখের অবস্থা বুঝে চশমা নেয়া হলো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, চশমা পছন্দ করা নিয়ে মা-ছেলের মধ্যে ভীষণ মতবিরোধ।
মা বলছেন, আমি এই চশমা ব্যবহার করবো, এটা আমার পছন্দ হয়।
আমি মাকে বললাম, না, তোমাকে এই চশমা ব্যবহার করতে হবে, এটা আমার পছন্দ।
শেষ পর্যন্ত আমার কথাই মেনে নিলেন। মা আমার পছন্দ করা চশমা ব্যবহার করতে লাগলেন।

নন্দিবাড়ি, মুক্তাগাছা থেকে

সিদ্ধান্ত

– জসীম উদ্দিন

দীর্ঘ কয়েক বছর প্রবাস জীবন কাটিয়ে ২০০০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। মরুভূমির তপ্ত আবাস ছেড়ে শ্যামল বন-বনানী ঘেরা রূপসী বাংলার ছোট গ্রামটিতে গিয়ে মুক্ত বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিলাম। চারদিক থেকে আত্মীয়স্বজন ও পড়শিরা আমায় দেখতে এলো। সবার এককথা এবার যেন বিয়েটা সেরে ফেলি।
শুরু হলো পাত্রী দেখার পালা। ঘটক ও আত্মীয়দের কথামতো কখনো কলেজ গেটে দাড়িয়ে, কখনো পরীক্ষার হলে গিয়ে, কখনো পাত্রীর নিজ কিংবা আত্মীয়দের বাড়ি গিয়ে, কখনো বা অভিজাত কোনো বিপণী বিতানে বসে অনেক পাত্রী দেখলাম। কিন্তু একটিও আমার পছন্দ হলো না। অবশ্য দুয়েকটা পাত্রী পক্ষ আমি প্রবাসী বলে আগ্রহও দেখায়নি।
গ্রাম-গ্রামান্তরে পাত্রী দেখতে গিয়ে দেখলাম নব্বইয়ের দশকের পর থেকে গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষার খুব প্রসার ঘটেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে যথেষ্ট উন্নত। আধুনিকতার ছোয়ায় গ্রাম্য জীবন ব্যবস্থা অনেকটা বদলে

গেছে। সেই সঙ্গে বদলে গেছে মানুষের মন। আগেকার দিনের সেই সরলতা গ্রামীণ মানুষের মাঝে এখন আর নেই। সরলতার বদলে সেখানে বাসা বেধেছে জটিলতা, কুটিলতা।

একের পর এক পাত্রী দেখে চলেছি, অথচ একটিও পছন্দ হচ্ছে না। পাত্রী সুশ্রী তো চরিত্র ভালো নয়, চরিত্র ভালো তো শিক্ষাগত যোগ্যতা কম আর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঠিক আছে তো পাত্রীর বংশ-মর্যাদা নিয়ে কথা ওঠে। এভাবে যখন দুই তিন মাস চলে গেল তখন দেখলাম আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবরা যারা আমার বিয়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল তারা একে একে দূরে সরে যাচ্ছে। সবার বক্তব্য, বিদেশে দীর্ঘকাল ধরে সুন্দরী মেয়েদের দেখে দেখে আমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশে এসে কোনো মেয়েই আমার পছন্দ হচ্ছে না।

আমার বক্তব্য ভিন্ন। বিয়ে তো জীবনে একটাই। আর আমিও তো ভিন্ন গ্রহের মানুষ নই। আমি চাই শাদা-সিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, মার্জিত স্বভাবের শিক্ষিত একটি মেয়ে।

অবশেষে একদিন আমার চাচা সম্পর্কীয় এক লোক আমাকে মিরসরাইয়ের কাছে একটি মেয়ে দেখাতে নিয়ে গেলেন। মেয়েটি ঢাকায় একটা কলেজে ডিগ্রি পড়ছে।

মেয়েদের নিজ বাড়ির ড্রয়িংরুমে আমার দুলাভাই ও এক চাচাতো ভাইসহ আমি বসে আছি। রুমটা ছিল ছিম-ছাম সাজানো এবং রুমের সামনে ছোট বাগানটিতে কয়েকটি ফুলের গাছ লাগানো যা দেখে চমৎকৃত হলাম। এর ভেতর আমাদের সামনে মরসুমি ফল-মূলও হরেক রকমের নাশতা পরিবেশন করা হলো। সূর্যাস্তের আগেই পাত্রীকে নিয়ে তার খালু আমাদের সামনে এলেন। আকাশী রঙের ফুলহাতার কামিজ আর সালোয়ার পরে টুপ করে সালাম দিয়ে নত শিরে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাড়ালো পাত্রী। পলকে দেখে নিলাম। হালকা-পাতলা একহারা গড়ন, শুভ্র গায়ের রঙ, ওড়নার একাংশ টেনে মার্জিত ঘোমটা দেয়া, চোখে সোনালি ফ্রেমের হালকা চশমা, নাকের নিচে গোফ রেখায় ছোট-কালো একটা তিল। একেবারেই অকৃত্রিম, প্রায় নিখুত। হ্যা, এই তো সেই *বনলতা সেন* যাকে খুজে চলেছি এতোদিন ধরে। মনে মনে বললাম, কোথায় ছিলেন এতোদিন?

ততোক্ষণ আমার চাচাতো ভাইটি তাকে সামনের খালি সোফাটায় বসতে বললেন।

কি নাম তোমার? আমার প্রথম প্রশ্ন।

জেসমিন। মৃদু স্বরে জবাব দিল সে।

শুধুই জেসমিন, নাকি আরো একটা নাম আছে?

হ্যা জেসমিন। তবে সবাই জেসি বলে ডাকে।

বাহ! খুব সুন্দর তো, ফুলের নামে নাম তোমার। তো পড়ালেখা কতোটুকু?

এবার ডিগ্রি পরীক্ষা দেবো।

এসএসসি ও এইচএসসি কোথা থেকে পাস করেছো?

বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা থেকে।

তুমি তো ঢাকায় থাকো, গ্রামের পরিবেশ তোমার ভালো লাগে কি?

ভীষণ ভালো লাগে।

আর কি ভালো লাগে?

বই পড়তে, বাগান করতে, অতিথি আপ্যায়ন করতে।

একজন মানুষের কোন গুণটা তোমার বেশি পছন্দ হয়?

সরল জীবন যাপন করা এবং সত্য বলা।

ও হ্যা, তোমার চশমাটা একটু দেখতে পারি কি?

সে তার চশমাটা খুলে আমার হাতে দিল। আর আমি সেটা নেড়ে-চেড়ে দেখে নিয়ে বললাম, তোমার দৃষ্টিশক্তি বুঝি কম? চশমাটা কি সব সময় ব্যবহার করো, নাকি মাঝে মধ্যে?

আমার দৃষ্টিশক্তি মোটেও কম নয়। চশমাটা আমি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করি যখন মাথা ব্যথা করে।

এখনো কি মাথা ব্যথা করছে?

হ্যা, সিরিয়াস ব্যথা করছে।

আমি কিছুটা বিমর্ষ হলাম। তার কথা শুনে আমারও মাথা ব্যথা শুরু হলো। সোফা ছেড়ে উঠে দাড়ালাম। তাকে বললাম, তুমি এখন যেতে পারো।

সে ভেতরে চলে গেল।

আমি তাদের বাগানে নেমে এলাম। কিছুক্ষণ পায়চারী করে আলো-আধারে চারপাশ দেখে নিলাম। চাচাতো ভাই ও দুলাভাইকে কাছে ডেকে তাদের মতামতটা জানতে চাইলাম।

তাদের একটাই কথা, বিয়েটা তোমার, সংসার করবে তুমি, সুতরাং সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে।

অতঃপর পাত্রী পক্ষকে আমার মতামত বা সিদ্ধান্তটা না জানিয়ে হাসিমুখে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বাড়িতে পৌছাতেই মা-বাবা, ভাই-বোন ও পড়শিরা সবাই আমাকে ঘিরে ধরলো পাত্রী কেমন সেটা শোনার জন্য।

পাত্রী সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা শুনে সবাই খুশি হলো। কিন্তু পাত্রীর চশমা পরা এবং মাথা ব্যথা করার কথাটা শুনে কেউ কেউ বেকে বসলো। তাদের সাফ কথা, পাত্রীর মাথা ব্যথার কারণটা হয়তো সাইনাস যেটা একটা সিরিয়াস রোগ। আর আমি হচ্ছি প্রবাসী। আমার প্রবাস যাপনকালে তার যদি মাথা ব্যথা ওঠে তখন তাকে কে দেখবে?

এরই মাঝে আমার ছোট বোনটা বলে উঠলো, যতো দোষ ওই চশমাটার, সেটা পরে মেয়েটা আজ ভাইয়ার সামনে না এলেই তো বিয়েটা হয়ে যেতো।

এ রকম দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে পরদিন চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে আরো একটা মেয়ে দেখে এলাম। বেশ পছন্দও হলো। এ মেয়েটি তার গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে এখন চট্টগ্রাম মহিলা কলেজে ভর্তি হয়েছে। থাকে বোনের বাসায়। যেহেতু সে সবেমাত্র ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে সেহেতু ভবিষ্যতে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার মতো সে যথেষ্ট মেধাবী কি না সেটা যাচাই করতে তার এসএসসির ফলাফল কেমন ছিল সেটা জানা প্রয়োজন। তাই চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি তার গ্রামের স্কুলে চলে গেলাম।

এই স্কুলের জনৈক শিক্ষক আমার স্বল্পকালীন শিক্ষকতা জীবনের সহকর্মী ছিল। তার সহযোগিতায় এই মেয়ের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী দেখে অবাক হলাম। সে আদৌ পাস করেনি আর ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার কথাটা ছিল সম্পূর্ণ ভুয়া।

হতাশ হয়ে বাসে করে তখন বাড়ি ফিরছিলাম। অমনি চলন্ত বাসে বসে সেদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিলাম। মানুষের জীবন তো এই বাসটার মতো গতিশীল। সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জীবনের গতি তো থেমে থাকে না। জেসি সহজ-সরল মেয়ে। সে তার রোগের কথা আমার কাছে গোপন রাখেনি। বিয়ের আলোচনায় সচরাচর মেয়ে পক্ষ যেটা করে, জেসি সেটা করেনি। সে অকপটে সত্য কথাটা প্রকাশ করেছে। এ রকম নিঃষ্পাপ, সত্য ও স্পষ্টবাদী মেয়ে জীবনে এলে আমার জীবনটাও জেসমিন ফুলের মতো সুন্দর হয়ে যাবে।

অগত্যা সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই চশমাওয়ালী মেয়েটিকে বিয়ে করে ঘরে এনেছি। সে এখন আমার ছয় মাস বয়সী কন্যা সাইমার গর্বিত মা। এখনো সে প্রায়ই চশমা পরে। তবে তার মাথা ব্যথা এখন তেমন নেই বললেই চলে।

আরব আমিরাত থেকে

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে

– শামসুর রাহমান

মনে পড়ে, ছেলেবেলা আমার চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। চোখে যাতে চারদিকের সব কিছু ভিন্ন রূপে ধরা দেয়, সে জন্যে ছোট চোখে খুব ছোট্ট চশমা সেটে দিতাম। ছোটদের মন ভোলাবার মতলবেই গ্লাসের জায়গায় পাতলা, রঙিন গোল কিংবা চারকোণা চামড়া লাগানো হতো। সেই চামড়া ভেদ করে আবছাভাবে বাইরের নানান কিছু দেখতে পেতাম আমরা ছোটরা। এতোকাল পরে আজও সেই ছোট্ট, রঙিন চশমার কথা মনে পড়ে। সত্যি বলতে কি, মন উদাস হয়ে যায়।

কিন্তু সত্যি সত্যি যে একদিন আমাকেও চশমা এটে নানান জায়গায় যেতে হবে, বই পড়তে হবে, লিখতে হবে টেবিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দৃষ্টি নিয়ে এতো বেশি যে ভাবতে হবে, কাটাতে হবে ঢের উদ্বিগ্ন প্রহর তা কি আমি ভেবেছিলাম আগে? তবে এখন কম বেশি প্রায়ই দুশ্চিন্তা আমাকে জাপটে ধরে।

একটুও বাড়িয়ে বলছি না, কখনো কখনো আমি দুর্ভাবনার খপ্পরে পড়ে একটি বাক্য লিখতে এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দিই। যাকগে, চশমার দিকে চোখ ফেরানো যাক। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরেই হঠাৎ একদিন আমার দুটো চোখই বিগড়ে যায়। দূরের বস্তু বেশ ঝাপসা মনে হয়। কিছুক্ষণ পড়াশোনা করলেই থেমে যেতে হয়। চোখের কোণে হালকা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এ রকম ছোট ছোট অসুবিধা রোজই আমাকে উৎপীড়িত করতে থাকে।

একদিন আমার এক হিতৈষী আমাকে একজন চোখ বিশারদের কাছে যেতে বললেন। এই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলেন যাতে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অবহেলা না করি। আমি কালক্ষেপণ না করে একজন চক্ষু বিশারদের শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাকে না ঘাবড়ানোর উপদেশ দিয়ে চোখে রোজ দুইবার একটি তরল ওষুধ ব্যবহার করতে বললেন। উপরন্তু একটি চশমা ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। প্রেসকৃপশনে চশমার পাওয়ারও লিখে দিলেন।

প্রথম প্রথম চশমা ব্যবহার করা খুবই বিরক্তিকর ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপারটি সয়ে এলো। কিন্তু চক্ষু ব্যাধির হামলা আদৌ সামান্য কিছু ছিল না। বড় জবরদস্ত হামলা ছিল সেটি, যা আজ অবধি ভোগাচ্ছে আমাকে।

আমি গ্লুকোমা–র খপ্পরে পড়েছি।

ওষুধের কল্যাণে এখনো কোনোমতে অন্ধত্বকে ঠেকিয়ে রেখেছি বটে কিন্তু ওষুধের মূল্য জোগাতে গিয়ে প্রাণপক্ষী প্রায় জীবনের শাখা ত্যাগ করতে সদা ব্যাকুল। অবশ্য কালেভদ্রে আমার কোনো কোনো প্রবাসী বান্ধব কিছু ওষুধ পাঠাতেন। বহুদিন থেকে আমি তাদের পার্সেল পাচ্ছি না। ডাক্তার ওয়ালেদ এবং কৌশিক আমার চোখের চিকিৎসার জন্য উদ্যোগী হন। আমার যাওয়া–আসা এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার ডাক্তার ওয়ালেদ বহন করেন।

তাদের এবং আরো কজন সংবেদনশীল ব্যক্তির কাছ থেকে জরুরি ওষুধ পেয়েছি যা আমার চোখ আর হৃদপিণ্ডকে কোনোমতে সচল রাখতে সচেষ্ট এখনো। অবশ্য তাদের সবার পক্ষে সব সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। কৌশিক কিছুদিন আগেও ওষুধের একটি প্যাকেট পাঠানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন বলে শুনেছি। কিন্তু সেই প্যাকেট আজও আমার কাছে পৌছেনি।

এতোক্ষণ যারা ধৈর্য ধরে আমার লেখাটি পড়ছেন তারা হয়তো বিরক্ত হয়ে মনে মনে ক্ষেপে উঠেছেন আমার বিরুদ্ধে। বলছেন, লোকটা তো শুনেছি কবি, তাহলে এতোক্ষণ রসকষহীন কিছু কথা বলে আমাদের সময় নষ্ট করছে কেন? কে ওকে এই অধিকার দিয়েছে? পাঠক–পাঠিকারা সাধারণত জম্পেশ প্রেমের কাহিনী পড়তে কিংবা শুনতে পছন্দ করেন। আমি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এখন আমি আমার চোখ সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যবহার করবো না, বলবো গরিব ঘরের একটি কালো মেয়ের কথা, যার চোখ দুটো ছিল অসামান্য। মেয়েটির গায়ের রঙ কালো, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আপনারা অনেকেই আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার সেই বিখ্যাত পংক্তির সঙ্গে পরিচিত – *কালো? সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।* আপনারা অনেকে নিশ্চয়ই হরিণের চোখ দেখেছেন এবং সেই চোখের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছেন। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, দুনিয়ায় এমন কোনো দু-পেয়ে মানব সন্তান নেই যে হরিণের চোখ দেখে *দূর ছ্যা ছ্যা* করতে পারে।

আমি যে গরিব ঘরের অপরূপ হরিণ নয়না কিশোরীর কথা উল্লেখ করলাম, তাকে যখন প্রথম দেখি তখন আমি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রথম শ্রেণীর উদাসীন ছাত্র। জানতাম, মাথা কুটে মরলেও সেই মেয়েটিকে কস্মিনকালেও জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাবো না। তাছাড়া সেই কালো হরিণ চোখ মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল চটজলদি।

এখন আমি পচাত্তর বয়সের বুড়োসুড়ো মানুষ। জীবনের অনেক কিছুই স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। কিন্তু সেই কালো মেয়ের এক জোড়া গাঢ় কালো চোখ আজ পর্যন্ত স্মৃতিতে জেগে ওঠে কখনো সখনো।

২৯ এপ্রিল ২০০৪

চাপা পড়া ইতিহাস

– মোহাম্মদ সোহেল রানা

চশমা বাণিজ্যিকভাবে আবিষ্কার করেন ১২৮৫ সালে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী স্পিনা। আমরা অনেকেই চশমা পরি। কিন্তু অধিকাংশই চশমার আদি ইতিহাস জানি না। এই চশমাকে কেন্দ্র করে রয়েছে এক পৌরাণিক কল্পকাহিনী।

১০১০ সালে চায়নায় চিয়াও সিং হাও নামের একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি গুহায় অনেক দিন ধরে সাধনা করতে করতে নিয়মিত চোখে চুলকানি অনুভব করতে থাকেন। সম্ভবত এটা ছিল এলার্জি যা তিনি বুঝতে পারেননি। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, তার সাধনা সঠিকভাবে হচ্ছে না। তাই ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। তিনি আরো বেশি বেশি করে সাধনা করতে থাকেন এবং রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কিছুতেই ভালো হলো না।

একদিন তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন যে, তাকে অভিপ্রয়াণে যেতে হবে। কাজেই তিনি যাত্রা শুরু করলেন ঠিকানা বিহীন গন্তব্যে। দীর্ঘ দিন যাত্রার পর তিনি উপস্থিত হন সমুদ্র তীরবর্তী একটি স্থানে। স্থানটি হচ্ছে ইনডিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত কন্যাকুমারী। সেখানে তিনি কিছু যুবক-যুবতীকে দেখে অবাক হন। একটি ছায়াছন্ন প্রান্তরে অনেক লোকের সমাগম দেখে কাছে যান। সেখানে দেখেন কিছু লোক ওইসব যুবক-যুবতীর চোখে গাছের নরম ও চিকন ডাল দিয়ে আবর্তন করায় এবং সঙ্গে সঙ্গে লাল বর্ণের কালি সদৃশ্য তরলে চোখটি চশমার আকৃতি ধারণ করে। এরা নাটক ও যাত্রার জন্য এভাবে সাজতো।

পরে তিনিও ওই গাছের নরম ও চিকন ডালের একপ্রান্ত চোখের ভ্রূর কাছে এবং অন্যপ্রাপ্ত চোখের নিচে লাগিয়ে দেন। ডালটি থেকে নির্গত আঠা তার চোখে ভরলে তিনি বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন এরপর থেকে চোখে আর চুলকানি হচ্ছে না। তারপর থেকে তিনি রোজ ওই ডালটি চোখে লাগান। কিন্তু সমস্যা হলো ডালটি ধরে রাখার বিড়ম্বনা। তাই ডালকে আটকানোর জন্য তিনি তালপাতার কিছু লম্বা অংশ পেচিয়ে গোল করে এবং দুটি কাঠি দুটি গোল অংশে লাগিয়ে কানে আটকিয়ে রাখেন। গোল অংশের ভেতরে ওই ডালটি আস্ত করে বসিয়ে রাখেন।

সন্ন্যাসীর এই মডেল পরবর্তীকালে কল্যাণকুমারীর ওইসব যুবক-যুবতীরা তার (চশমাকৃতি) পাতা দিয়ে গোল করে চোখে লাগিয়ে যাত্রা, নাটকে দেখান। এতে দর্শকরা আনন্দ পান।

এভাবেই ওই সন্ন্যাসীর প্রাকৃতিক চশমা পরবর্তীকালে চারদিকে প্রসার লাভ করে এবং বর্তমান চশমার আর্বিভাব ঘটে। বাংলাদেশের গ্রামে ছোট ছেলেমেয়েরা এখনো তালপাতার চশমা, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি তৈরি করে খেলে যা কাহিনীরই স্বাক্ষর বহন করে।

মুদিপাড়া, দিনাজপুর থেকে

ইচ্ছা পূরণ

– ফয়সল আহমেদ

আমার বন্ধুর ভাইয়ের চশমার দোকান ছিল। সেই সূত্রে চশমার দোকানে মাঝে মধ্যে সময় কাটাতাম। একদিন বন্ধুর ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমেরিকার রে-ব্যান (Ray-Ban) সানগ্লাসের আলাদা একটি বৈশিষ্ট আছে। আমেরিকার রে-ব্যান সানগ্লাসের ফ্রেমে সোনার প্রলেপ দেয়া থাকতো। কিন্তু এখন আমেরিকার রে-ব্যান খুব কম পাওয়া যায়। যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দুই নাম্বার। সিংগাপুর ও অন্যান্য দেশ থেকে আসে। সেগুলো আমেরিকার বলে দোকানিরা বিক্রি করে থাকে।

সেদিন থেকে অরিজিনাল আমেরিকার রে-ব্যান সানগ্লাস কালেকশন করা ও পরার ইচ্ছা মনে মনে লালন করতে থাকি। মনের ইচ্ছা কিছুটা বাস্তবতার রূপ নিল যেদিন জানতে পারলাম আমার ছোট মামা-মামি ডিভি ভিসা পেয়েছেন এবং খুব অল্প দিনের মধ্যে আমেরিকা চলে যাবেন।

মামা-মামি আমেরিকা চলে যাবার আগে সব মামা, খালা এবং খালাতো ভাইবোনদের সবার নিমন্ত্রণ হলো নানার বাড়িতে মামাদের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য।

সেদিন আমার মামা-মামিকে বলেছিলাম আমার ইচ্ছা, আমার লালিত স্বপ্নের কথা। বলেছিলাম, আপনারা যে সময় দেশে আসবেন সেই সময় আমার জন্য একটা রে-ব্যান সানগ্লাস নিয়ে আসবেন। আমার আর কিছু চাই না আপনাদের কাছে।

মামি আদর করে আমাকে *বাপ* বলে ডাকতেন। সেদিন মামি বলেছিলেন, বাপের ইচ্ছা যদি পূরণ করতে না পারি তাহলে কেমন মেয়ে আমি।

মামা-মামি আমেরিকাতে চলে গেলেন। এক মাস দুইমাস তিন মাস, এভাবে দুটি বছর কেটে গেল। নানুর শরীর খারাপ। তাই মামা-মামি দেশে আসবেন পনেরো দিনের জন্য নানুকে দেখতে।

যেদিন শুনলাম মামা-মামি দেশে আসবেন সেদিন থেকে মামাদের আসার দিন পর্যন্ত এক একটা দিন আমার কাছে এক একটি বছর মনে হয়েছে। সত্যি মামা নিয়ে আসবেন তো সানগ্লাস! মনে আছে তো তাদের? নিয়ে এলে পরলে কেমন লাগবে আমার ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে থাকি।

দেশে ফেরার পর মামার সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো তখন মামার চোখে খুব সুন্দর একটা সানগ্লাস ছিল, রে-ব্যান সানগ্লাস।

আমার মামা এবং খালারা ছিলেন দশ ভাইবোন। তাদের ছেলেমেয়ে আমিসহ ছাব্বিশজন। খালাতো, মামাতো দুই একজন ভাইবোনেরও দুই একটা করে ছেলেমেয়ে আছে।

মামার ফিরে যাবার সময় হয়েছে। আবার সবার নিমন্ত্রণ হলো নানার বাড়িতে। সেদিন মামা আমাদেরকে বললেন, আমি তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি তোমার নানুকে দেখতে, সেই জন্য বেশি কিছু শপিং করতে পারিনি। তবে কম বেশি সবার জন্য কিছু একটা জিনিস এনেছি। সেগুলো লিস্ট করে তোমাদের বড় মামার কাছে দিয়েছি। আমি চলে যাওয়ার পর তিনি সেগুলো তোমাদের সবাইকে দিয়ে দেবেন। এবং এ নিয়ে তোমরা কেউ মনঃক্ষুণ্ন হবে না।

মামা–মামি চলে যাওয়ার পর বড় মামা যার যে জিনিস লিস্ট করা ছিল সেগুলো দিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, তোমার পড়াশোনার জন্য পাচ হাজার টাকা দিয়েছে। তখন মুহূর্তের মধ্যে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমার গায়ে এক ফোটাও রক্ত নেই। আমি আর উঠতে পারবো না, চলতে পারবো না। আমি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি। চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছিল। নিস্তব্ধ হয়ে কতোক্ষণ বসেছিলাম জানি না। পরে জানতে পারলাম সেই রে–ব্যান সানগ্লাসটা মামা তার ছোট শালা অর্থাৎ মামি তার ছোট ভাইকে দিয়ে গেছেন।

সেই অভিমানে আমি আর কোনোদিনও তাদেরকে সানগ্লাস সম্বন্ধে কিছু বলিনি।

আমার স্বপ্ন, আমার ইচ্ছা, পূরণ করি আমার চাকরির প্রথম মাসের বেতন দিয়ে আমার সেই বন্ধুর ভাইয়ের চশমার দোকান থেকে রে–ব্যান সানগ্লাস কিনে। জানি না সেটা অরিজিনাল আমেরিকার ছিল কি না। আমেরিকার হোক না হোক, সেটাতো রে–ব্যান সানগ্লাস।

সাতক্ষীরা থেকে

মুক্তি চাই

সেই ১৯৯৭ সাল থেকে সে আমার সঙ্গী। আমি তাকে পছন্দ করি না। তাকে আমি যতোই ছাড়তে চাই, সে আমাকে ততো আকড়ে ধরে। ১৯৯৭–এ ছিল -2 পাওয়ার আর বর্তমানে -7.35-এর ওপরে।

প্রতি বছর ডাক্তার দেখাতে গেলে পাওয়ার বাড়ে। প্রায়ই ডাক্তারকে বিকল্প কিছু দিতে বলি। তিনি আমার সমস্যা বুঝতে পেরে প্রায় দেড় বছর আগে মিরপুরের (ল্যাসিক অপারেশন) ঠিকানা দিলেন। খুশি মনে ঠিকানা নিয়ে এলাম।

আমাকে আর চশমা পরতে হবে না সেই আনন্দে বিভোর আমি। কতোভাবে কল্পনা করলাম নিজেকে, আয়নার সামনে দাড়িয়ে চশমা খুলি, পরি। আবার খুলি। নাহ! চশমা ছাড়াই ভালো।

অপারেশনের জন্য যোগাযোগ করলাম ঢাকায় অবস্থানরত ভাইদের সঙ্গে। ঢাকায় গেলাম। প্রাথমিক টেস্টও হলো, দুদিন পর যখন অপারেশনের টাকা অ্যাডভান্স জমা দিতে হবে তখনই দেখা দিল বিপত্তি। কে টাকা দেবে। কোনো ভাই–ই টাকা দিতে রাজি হচ্ছেন না। তখন থেকেই আমার মনের কোণে মেঘ জমতে শুরু করলো। আমার আশা বিফলে যাবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। জীবনের সব ধরনের হিসাব–নিকাশে শুধু পরাজিতই হলাম। অথচ তা হবার কথা ছিল না। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় বটে কিন্তু ত্রিশ পয়ত্রিশ হাজার টাকার অপারেশনের অবস্থা যে আছে তা ভালো করেই জানি।

অপেক্ষা করছি আমার ভাইদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। তাদের বিবেক সাড়া দেবে। তারা বুঝবে স্ত্রীর প্রতি যেমন দায়িত্ব তেমনই ছোট ভাইবোনদের প্রতিও তাদের দায়িত্ব রয়েছে। তারা আমার অপারেশনের ব্যবস্থা নেবে সেই অপেক্ষায় আছি। কারণ চশমা আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ও বিরক্তিকর একটি জিনিস। আমি চশমা থেকে মুক্তি চাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিলেট থেকে

শর্ত

– সম্পা

চশমা কিছুটা ফ্যাশন, কিছুটা প্রয়োজনীয়। এর জন্য আনন্দ আছে আবার বিড়ম্বনাও আছে। চশমা ফ্যাশন করে পরতে ভালো লাগে। কিন্তু প্রয়োজনে পরতে বাধ্যবাধকতা খুব সমস্যা সৃষ্টি করে। চশমা ফ্যাশনও

ভালো লাগে না, প্রয়োজনেও ভালো লাগে না। ভালো লাগে না বলেই যে সব সময় এড়িয়ে যাওয়া যায় তা কিন্তু নয়।

২০০১ সালে এইচএসসি পরীক্ষার কিছু আগে আমার মাথা ব্যথা শুরু হলো এবং চোখেরও সমস্যা দেখা দিল। বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা দেখতে থাকি। এ এক বিড়ম্বনা। অবশেষে ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার দেখেশুনে, পরীক্ষা করে কিছু ওষুধসহ চশমা পরার পরামর্শ দিলেন। ওষুধ ও চশমা দুটোই আমার কাছে অসহ্য। ওষুধ তবু তিন বেলা খাওয়া যায়। কিন্তু চশমা পরতে ভালো লাগে না।

তবুও পরীক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই চশমা ব্যবহার করতে থাকি। পরীক্ষা শেষ করেই চশমা ফেলে রাখলাম। উপন্যাস, পত্রিকা নিয়মিত পড়া আমার অভ্যাস। কিন্তু পড়া শুরু করলেই চোখে ব্যথা হয়। একনাগারে বেশিক্ষণ পড়তে পারি না। তারপরও চশমা ব্যবহার করতে ভালো লাগে না। বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে চশমা ছাড়াই পড়ি। এতে যে আমার ক্ষতি হচ্ছে এটা আমি বেশ বুঝতে পারি। তবে কাউকে বুঝতে দিই না।

এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে দুই বছর। আমার সংসার হয়েছে, সেই সঙ্গে মাথা ও চোখের সমস্যাও বেড়েছে। তবুও চশমা পরতে ভালো লাগে না। আমার স্বামী সব সময় আমাকে চশমা পরতে বলেন। কিন্তু তাকে প্রায়ই ফাকি দিই। তাকে ফাকি দিয়ে দিয়েই ইতিমধ্যে চোখের বারোটা বাজিয়েছি।

যায়যায়দিনের *প্রবাসী* প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পড়েছি এবং এটা পড়তেই চোখের সমস্যা প্রকট হয়েছিল। ইতিমধ্যে তৃতীয় পর্বও বেরিয়েছে। আমার মাথা ব্যথা আর লুকোতে পারলাম না। আমার স্বামী *প্রবাসী* তৃতীয় সংখ্যা এনে পরবর্তী বিষয় *চশমা* দেখিয়ে অধ্যাদেশ জারি করলো যে, চশমা ছাড়া এ সংখ্যা ব্যবহার করতে পারবে না। এ কেমন বিপদ! অবশেষে শর্ত মেনে নিয়ে প্রবাস তৃতীয় পর্ব শেষ করলাম এবং পরবর্তী সংখ্যায় চশমা সম্পর্কেই লিখে পাঠালাম।

সিরাজগঞ্জ থেকে

পাচ মিশালি

– জাহিদ ইকবাল

এক.

তখন আমি কুর্মিটোলা হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ি। সামনেই সমাগত ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে বেশ কিছু ইভেন্টে অংশ নিলেও যেমন খুশি তেমন সাজো পর্বে কানা বাবা সাজার ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ছেড়া লুঙ্গি, ছেড়া পাঞ্জাবি, হাতে বাকা লাঠি আর চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা পরে প্রিয় ভাগ্নি রিয়ানা তাজরীনকে নিয়ে হাজার হাজার দর্শকদের সামনে কানাবাবা সেজে হাত পেতেছি। অসহায় কণ্ঠে মামা ভাগ্নি মিলে গেয়েছি *বাবু একখান ভিক্ষা দেনগো বাবু একখান ভিক্ষা দেন।* তাজরীন থালা নিয়ে আগে আগে যায়, আমি কানা বাবা তার পেছনে।

মাঠের চার পাশে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। সেই ভিড় থেকে টক, ঝাল, মিষ্টি নানান রকম মন্তব্যে বুঝতে পারছিলাম আমার কানাবাবা সাজা সার্থক হতে চলেছে। তাছাড়া দর্শকদের দানের টাকায় তাজরীনের হাতের থালা পরিপূর্ণ প্রায়। মনে পড়ে, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এরশাদের এক মন্ত্রী। তিনি খুশি হয়ে আমাদের থালায় পাচশ টাকার দুটো নোট দিয়েছিলেন। আমি এ কানা বাবা সেজে ওইদিন লজ্জাও পেয়েছিলাম। কারণ তখনো লুঙ্গি তেমনভাবে পরতে পারি না। চব্বিশ ঘণ্টাই প্যান্ট পরি। কিন্তু কানা বাবা সাজতে গিয়ে শেষ পর্যায়ে মাঠের মধ্যে দর্শকদের সামনে লুঙ্গি খুলে মাটিতে পড়ে যায়। তখন আর কি করা, লুঙ্গি রেখেই দে দৌড়। চার পাশে দর্শকরা হাসাহাসি শুরু করলো, হায় সে কি লজ্জা! লজ্জায় পুরো এক সপ্তাহ স্কুলেই যাইনি।

দুই.

ঢাকায় হাতেগোনা কিছু দোকান ছাড়া সব মার্কেটে, সব দোকানেই দামাদামি করে জিনিসপত্র বিক্রি করা, কেনাটাই যেন আজ স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। উত্তরার *লন্ডন প্লাজা*-য় গিয়েছি একদিন। উদ্দেশ্য ভালো দেখে একটি সানগ্লাস কেনা, আমার বাজেটের সীমাবদ্ধতা এক হাজার টাকার মধ্যে। দোকানে ঢুকে চিত্রনায়ক নাঈমকে দেখতে পেলাম। তিনিও এসেছেন সানগ্লাস কিনতে। আমি এদিক সেদিক সানগ্লাস দেখছি সে সঙ্গে লক্ষ্য করছি নাঈম কেমন সানগ্লাস পছন্দ করেন বা কতোটা দামি। তিনি একটি সানগ্লাস পছন্দ করে তার দাম জিজ্ঞাসা করলেন।

দোকানদার দাম বললো তিন হাজার টাকা।

এ কথা শুনে নাঈম অবাক হয়ে গেলেন, এক পর্যায়ে কিছুটা দামাদামিও হলো। দামাদামিতে তিন হাজার টাকার সানগ্লাস নাঈম কিনে নিলেন সাড়ে চারশ টাকায়।

নাঈমের সচেতনতায় মুগ্ধ হয়ে আমিও তার একটি নিলাম। আমি এটা কিনলে হয়তো এর দাম অনেক বলতাম এবং নির্ঘাত ঠকতাম।

তিন.

মোবাইলে ইমার্জেন্সি কল! ট্যাকসি ক্যাব নিয়ে ছুটে গেলাম বন্ধু শাহজাহান সাজুর Sungei Kadut Ave.-এর বাসায়। বাসায় গিয়ে শুনতে পেলাম সে হেকিং করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে বস তাকে সিংগাপুর জেনারেল হসপিটালে নিয়ে গেছে। তার বাম চোখের অবস্থা নাকি খুবই গুরুতর। আবার ছুটলাম হসপিটালের উদ্দেশ্যে, ওখানে পৌছে ইমার্জেন্সিতে বন্ধুর খোজ নিয়ে তার ক্যাবিনে তাকে দেখতে গেলাম। তার অবস্থা দেখে ভয়ে চমকে উঠলাম।

বন্ধু আমায় দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললো, আমি শেষ হয়ে গেছি জাহিদভাই, আমার কি হবে! এ অ্যাক্সিডেন্ট-এর জন্য কেউ নয়, আমিই দায়ী। কারণ হেকিং করার সময় আলসেমি করে সেফটি সানগ্লাস পরিনি, যার জন্য হেকিংয়ের সময় লোহার ক্ষুদ্র একটি টুকরো বিনা বাধায় আমার বাম চোখে আঘাত হানে। ডাক্তার বলেছে, অ্যাক্সিডেন্টে চোখের এমনই ক্ষতি হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে এ চোখ দিয়ে কিছু নাও দেখতে পারি। এই বলে সে আবারও ডুকরে কেদে ফেললো।

তাকে শক্তি, সাহস দিলাম। ধৈর্য ধারণ করার কথা বললাম। এরপর সুদীর্ঘ দেড় বছর চিকিৎসা শেষে অবশেষে গত দুই মাস আগে সে দেশে ফিরে গেল। তার চোখ ভালো হয়নি। অপারেশন করে কৃত্রিম চোখ বসিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার। এ চোখে সে আর কোনোদিন কিছুই দেখবে না। জাস্ট ফর শো। হেকিং বা এ জাতীয় কাজ করার সময় দেশ-বিদেশে অবশ্যই সেফটি সানগ্লাস ব্যবহার করা উচিত।

চার.

১৯৯৬ সালের ৪ ডিসেম্বর সাড়ে তিন বছর সিংগাপুর প্রবাস জীবন কাটিয়ে যখন দেশে ফিরি তখন কাস্টমস-এর আনুষঙ্গিকতা শেষ করে বিমানের জন্য লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করছি। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার উল্টো পাশের সিটে সিংগাপুরের টিভি *চ্যানেল ফাইভ*-এর জনপ্রিয় তারকা গারমিত সিংকে দেখলাম সুন্দরী সুদর্শনা একজনের সঙ্গে কথা বলতে। লক্ষ্য করলাম, এয়ারপোর্টের অনেকেই গারমিত-কে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে। হঠাৎ দেখলাম তারা উঠে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভাবলাম হয়তো তাদের বিমানে আরোহণ করার সময় হয়ে গেছে। এদিকে আমিও পা বাড়ালাম ঊনত্রিশ নাম্বার গেটে অপেক্ষারত থাই এয়ারওয়েজের দিকে। এমন সময় লক্ষ্য করলাম, উল্টো দিকের সিটে অর্থাৎ গারমিত যেখানে বসেছিলেন সেখানে একটি সানগ্লাস পরে রয়েছে। সানগ্লাসটি যে গারমিতের-ই এ ব্যাপারে সন্দেহ রইলো না।

অদূরে গারমিতকে দেখলাম। মুহূর্তের মধ্যে সানগ্লাসটি হাতে নিয়ে তাকে দেয়ার জন্য দৌড়ে ছুটে গেলাম। কিন্তু বিশালকায় সিংগাপুরের চাংগি এয়ারপোর্টে মুহূর্তের মধ্যে তাকে হারিয়ে ফেললাম। ভাবলাম তিনি হয়তো ইতিমধ্যে কোনো বিমানে উঠে পড়েছেন কি করবো! উপায়ান্তর না দেখে সানগ্লাসটি নিয়েই বিমানে উঠলাম। এবং আমার নির্ধারিত আসনে বসে পড়লাম। আমার একেবারে সামনেই ছিল বিজনেস ক্লাস। হঠাৎ সেখানে গারমিত-এর মতো কাউকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠি। এরপর সরাসরি উঠে গিয়ে দেখি, আসলেই গারমিত। তাকে তার ফেলে আসা সানগ্লাস-এর কথা বলতেই তিনি এক ঝলক হেসে হাত বাড়িয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমার পরিচয়, দেশ, সিংগাপুরে কি করি, কতো বছর যাবৎ আছি এমনি বহু কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বার বার ধন্যবাদ দিলেন, প্রশংসা করলেন এবং দিয়ে দিলেন তার প্রিয় সানগ্লাসটি। আমি নিতে চাইনি। তিনি বললেন, দিস সানগ্লাস লাইকস ইউ। ইট ডাস নট লাইক মি। ইট ডাস নট লাইক সিংগাপুর। ইট লাইকস ইউ।

তারপর থেকে পরম যত্নে সানগ্লাসটিকে ব্যবহার করি। চ্যানেল ফাইভ এ আজও তার প্রোগ্রাম দেখলে মনে হয় তিনি যেন আমার খুব কাছের, দূরের কেউ নন!

পাচ.

সিংগাপুরের কার্লসবার্গ বিয়ার কম্পানিতে খণ্ডকালীন চাকরির সময় সেখান থেকে Carlsberg-এর মনোগ্রাম খচিত সাতটি সানগ্লাস গিফট হিসেবে পাই। ছোট ভাই আলম দেশে ফেরার সময় তা তার সঙ্গে দিয়ে দিই আমার বেশ কিছু প্রিয়জনকে দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঢাকা এয়ারপোর্টে বেরসিক কাস্টমস কর্তারা নানান অজুহাতে ভয়-ভীতি দেখিয়ে আলমের কাছ থেকে চারটি সানগ্লাস ছিনিয়ে নেয়। ফোনে এ কথা শোনার পর আমার কি যে খারাপ লেগেছিল সেদিন তা অবর্ননীয়। এভাবে আর কতো! কতোকাল আমরা প্রবাসীরা এমনি নানানভাবে হয়রানির স্বীকার হবো, এয়ারপোর্টে জ্বলবো-পুড়বো, অবহেলায় ভাসবো। এর কি কোনো শেষ নেই?

সিংগাপুর সিটি থেকে

গুরুত্ব

– মোহাম্মদ নায়েমুল করিম

রিফ্রেকশন যার অর্থ, চোখ দেখে নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে ওই চোখে দৃষ্টিজনিত ত্রুটি আছে কি না তা বের করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা দেয়া অর্থাৎ চশমা দেয়া।

আমাদের দেশে অনেক লোকই এ রিফ্রেকশন সম্পর্কে জানেন না। যিনি রিফ্রেকশন করেন তাকে বলা হয় রিফ্রেকশনিস্ট।

রিফ্রেকশনিস্ট পরীক্ষা দ্বারা একজন যার দৃষ্টি ত্রুটি আছে এমন রোগীকে চশমার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

চশমা প্রয়োজনে তো অবশ্যই পরতে হবে। সানগ্লাস বা অন্যান্য ফটো ক্রোমাটিক গ্লাস আছে যা আমাদের চোখকে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও ফরেন বডি বা বাহ্যিক ধুলোবালি এবং আঘাত থেকে চোখকে রক্ষা করে।

এমন এক সময় ছিল, কোনো ছেলেমেয়ে স্কুলে চশমা পরে যেতে পারতো না। হয়তো শিক্ষক অথবা বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন কথা শুনতে হবে এই ভয়ে। আজকের যুগে ছেলেমেয়েরা স্বচ্ছন্দে চশমা পরছে। এবং বর্তমানে এটা ফ্যাশনেবল।

আমাদের দেশে সবার মাঝে একটা ভুল ধারণা আছে, চশমা শুধু বুড়োরাই পরে। এবং অনেকের এই ধারণাও আছে যে, চশমা পরলে ধীরে ধীরে চোখ বোধহয় আরো নষ্ট হয়ে যাবে। যদিও ব্যাপারটা উল্টো। চশমা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে না দিলে বরং চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

চল্লিশ বছর বয়সে আমাদের দেশে যাকে চল্লিশে বলা হয়, ইংরেজিতে সেটা হলো *প্রেসবায়োপিয়া।* তখন প্রায় সকলকেই পড়ালেখা বা কাছের কাজের জন্য চশমা নিতে হয়। অনেকে আৎকে ওঠে। কিন্তু এটা খুবই স্বাভাবিক।

যারা কাছে দেখে, দূরে দেখে না বা *মায়োপিয়া* অথবা দূরে দেখে কাছে দেখে না *হাইজারোপিয়া* এ ধরনের কাছে ও দূরে দেখার দৃষ্টিজনিত ত্রুটি অনেক ছেলেমেয়েদের আছে। এই ধরনের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় পাওয়ার নিয়ে চশমা পরা অত্যন্ত জরুরি।

অনেক সময় চশমার ব্যবস্থা নিয়েও অনেক মেয়ে চশমা পরে না এ জন্য যে, চশমা পরা মেয়ের বিয়ে হবে না। এক্ষেত্রে ঘরের বড়রাও খুব একটা গুরুত্ব দেন না। কিন্তু এতে করে চশমার অভাবে চোখ তার কার্যক্ষমতা দিনে দিনে আরো হারিয়ে ফেলবে বা অলস হয়ে যাবে যাকে বলা হয় *এমব্লায়োপিয়া*। এ কারণে হারানো দৃষ্টি আর কখনো ফিরে আসবে না অথবা ট্যারা বা স্কুইন্ট হয়ে যেতে পারে।

মাথা ব্যথা এটি একটি কমন কথা। অনেক কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। প্রয়োজনীয় লেন্স দিয়ে চশমা পরলে অনেক ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়।

অনেকেই চশমা পরতে চায় না যদিও এটা খুবই জরুরি। অন্য কোনো ওষুধ, ট্যাবলেট, ড্রপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু জেনে রাখতে হবে, চশমার প্রয়োজন শুধু চশমা দিয়েই মেটানো সম্ভব।

বিজ্ঞান আমাদেরকে অনেক এগিয়ে নিয়েছে। আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও চোখের ডাক্তাররা পর্যন্ত একটা রোগীকে বেশি পাওয়ার চশমা দিতে ভয় পেতেন। এখন দেখা যাচ্ছে, যার ক্ষেত্রে যতো পাওয়ারের চমশা লাগুক না কেন এটাই তার জন্য স্বাভাবিক।

আমরা অনেক সময় অফিস, ব্যাংকে দেখতে পাই ভারী চশমা পরে কোনো ব্যক্তি খুব কাছ থেকে লেখাপড়ার কাজ করছে। আমরা ওই ব্যক্তির অতীত কথা জানতে চাইলে হয়তো বা শুনতে পাবো, ছোট বয়সে তার পরিবারের বড়রা, এমনকি কোনো ডাক্তার তাকে পড়ালেখা করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু তিনি পড়ালেখা ঠিকই করেছেন এবং আজকে এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। তার চোখের দৃষ্টি যেমন ছিল তেমনি আছে।

শিশুর চশমা সম্পর্কে কিছু কথা

- অভিভাবকরা সাধারণত চান না তার সন্তান চশমা পরুক।
- চশমাজনিত ত্রুটি যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলেই শুধু শিশুদের চশমার ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়।
- শিশুর চশমাজনিত সমস্যার ব্যাপারে অভিভাবকের অনিচ্ছা এবং অবহেলার জন্য অনেক শিশুর চোখ চিরতরে অলস বা এমব্লায়োপিয়া হয়ে যায়।
- শিশুর চশমাজনিত ত্রুটি থাকলে তাকে চশমার জন্য তিরস্কার না করে চশমা পরতে উৎসাহিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- শিশুর চশমা মাঝে মধ্যে ভেঙে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে অথবা আবার দেখিয়ে জরুরিভাবে চশমা বানাতে হবে এবং ছয় মাস অন্তর অন্তর তা পরীক্ষা করে নেবেন।

বাগিচাগাও, কুমিল্লা থেকে

কাচ বিহীন

– দন্তস এইচ

১৯৯৮ সালের কথা। আমি নিজেই একটি গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা তৈরি করেছিলাম। যদিও চশমার মধ্যে কোনো আবরণ ছিল না অর্থাৎ চোখ দুটোকে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ থেকে রক্ষার জন্য চশমা কিংবা সানগ্লাসে যে কাচ থাকে তা ছিল না। গোল্ডেন তার (কেউ বলে গুনা) সবাই চিনেন তা বলবো না। বাশের বেড়া ও টিনের বেড়া এবং বিল্ডিং তৈরির সময় বাধার কাজে যে তার লাগে ওইটি সে তার নয়। গোল্ডেন তার সাধারণত ব্যবহার হয় বিভিন্ন মোটর বাধানোতে। যেমন, ফ্যানের মোটর, পানির পাম্পের বিভিন্ন মোটর ইত্যাদিতে। তো ওই কাচ ছাড়া চশমাটি এতোই সুদৃশ্য হয়েছিল যে প্রায়ই ঘরোয়াভাবে এমনকি বাইরেও ব্যবহার করতাম।

পরিবারের সবাই জানলেও বাইরের লোকজন জানতো না। চশমার গোপন রহস্য। এমনকি ঘরে, বাসায় যখন চশমাটা ব্যবহার করতাম সে সময় যদি কোনো ফ্রেন্ড বা গেস্ট আসতো সেও বুঝতে পারতো না। বরং বলতো, বাহ! তোর চশমাটি খুব সুন্দর।

মুচকি হেসে বলতাম, তাই নাকি?

সবাই যেটিকে সুন্দর বলে সেটিকে অসুন্দর বলার দুঃসাহস আমার নেই, কখনোও ছিল না। এবং আগামীতেও হবে না আশা রাখি।

গোল্ডেন ফ্রেমের চশমাটিকে ফটোর ফ্রেমের ধরে রাখার ইচ্ছা হলো। ব্যাকব্রাশ হেয়ার স্টাইলে চশমাটি যথাস্থানে লাগিয়ে একটি চেয়ারে বসে ক্যামেরার সামনে পোজ দিলাম। ক্যামেরার পেছনে যে ব্যস্ত সে হলো আমার ইমিডিয়েট ছোট বোন শম্পা।

কয়েকদিন পর শম্পা যখন আমার ছবিটি আমাকে দেখালো, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, ছবিটির ব্যক্তি আমি স্বয়ং। কেননা বাস্তবে আমার যা চেহারা তারচেয়ে কয়েকগুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল শুধু ওই চশমাটির বদৌলতে যেটি কি না আমিই বানিয়েছি। তাও আবার গ্লাস ছাড়া। অবশ্য একটি ছবি ভালো হওয়ার পেছনে যে কয়েকটি কারণ থাকে তার একটি হলো, ছবিটি যে তোলে তার কারসাজি অন্যতম। পাচ বছর হয়ে গেল, ওই চশমা পরে ছবিটি আজও আছে। সেই সঙ্গে আছে সেদিনের সেই ব্যাকব্রাশ হেয়ার স্টাইল। কিন্তু চশমাটি নেই। কোথায়, কখন, কিভাবে ওই চশমাটি হারিয়ে গেল মনে নেই। ওই চশমাটিকে ভালোবাসার দরুণ দ্বিতীয় আর কোনো চশমা বানাইনি।

আমার জন্মের পর থেকেই যাকে মোটা ফ্রেমের পাওয়ারযুক্ত কাচ সংবলিত চশমা পরতে দেখেছি তিনি হলেন আমার প্রিয় দাদা। দাদা যখন মোটা ফ্রেমের চশমাটি নাকে বসাতেন তখন কি যে সুন্দর লাগতো তা লিখে বুঝাতে পারবো না। প্রিয় পাঠক, আমার দাদা আপনাদের দাদার মতো Male ছিলেন না। আমার দাদা ছিলেন Female. হয়তো ভাবছেন, এটা কি করে সম্ভব? কি করে সম্ভব হলো তা একটু বলি।

আমরা ভাইবোনরা কেউ–ই আমাদের জন্মের পর দাদাকে দেখিনি। দাদার রূপ রহস্য স্বচোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সে জন্যই আমরা ভাইবোনেরা দাদিকেই দাদা বলে ডাকতাম। চোখে দেখতাম দাদি আর মুখে বলতাম দাদা। একজনের কাছ দুজনের আদর, ভালোবাসা গ্রহণ করতাম। এবার নিশ্চয়ই Clear প্রিয় পাঠক?

দাদা গোসল ও ঘুমানোর সময় চশমাটি সযত্নে খুলে রাখতেন। আর বাকি সময়টুকু মোটা ফ্রেমের চশমাটিকে নাকের উপরের অংশে বসিয়ে রাখতেন। আজ দাদা আমাদের মাঝে নেই। আমাদেরকে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে দাদা, Male দাদার কাছে চলে গেছে। কিন্তু রয়ে গেছে দাদার ব্যবহৃত সব কিছু। সে সঙ্গে রয়ে গেছে দাদার

ব্যবহৃত মোটা ফ্রেমের পাওয়ার সংযুক্ত লেন্সের চশমাটি। চশমাটি এখন আমাদের শোকেসের শোভা বর্ধন করছে। চশমাটির দিকে চোখ রাখলেই দাদার সুন্দর মুখটি ভেসে ওঠে আমাদের মানসপটে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

চার আনা

– মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

আমার শৈশবের কথা। একদিন আগে থেকেই মাকে পটাচ্ছিলাম। তর সইছিল না।

মা বলছিলেন, যাবি তো, সময় হোক।

শেষে মাহেন্দ্র ক্ষণটি উপস্থিত হলো।

মা আমাকে হাফ প্যান্ট, জামা, জুতো পরালেন। মাথায় ভালো করে সরিষার তেল মেখে বাম দিকে সিথি কেটে দিলেন। এবার যাবার পালা।

আমার মুখে চাদের হাসি ফুটে উঠলো। মার মুখেও। তিনি আচলের গিট থেকে একটা চার আনার সিকি বের করে আমার পকেটে গুজে দিলেন।

আমি আবার হাসলাম। পরম তৃপ্তির হাসি।

তখন বৈশাখ মাস। রাস্তার দুই ধারে আমার সমান উচু পাট ক্ষেত। সবুজ পাটের চারাগুলো এদিক–ওদিক বাতাসে দুলছে। আলপথে যাচ্ছি। মেলায়। অনেক দিন আগে থেকে মেলায় যাবার আকাঙ্ক্ষা মনের গভীরে সুপ্ত ছিল। এখন বাস্তবে যাচ্ছি। চারদিকে মানুষের স্রোত। মেলার স্থান থেকে গম গম শব্দ ভেসে আসছে। আমাদের স্কুলের পশ্চিম দিকে পাট কুড়া নদীর তীরে মেলাটি বসে প্রতি বছর। বাড়ি থেকে আধা মাইল দূরত্বে। নাম রঘুনাথপুরের অষ্টমী মেলা। মেলা আমাকে টানছে চুম্বকের মতো। যেন মেলার গন্ধ ভেসে আসছে নাকে, উথলে উঠছে মন।

মেলায় ওঠার পথে, বটুতেলি তেলের দোকান ধরেছে। আমাকে একটু বসতে বললো খাতির করে। আমি তার হিসাব লিখে দিই।

বললাম, সময় নেই।

যবর মিয়া চালের চটি ফেলেছে। পাস করলাম। তামাক পাতার মহাল, ঝাঝালো গন্ধ। পুকুর পাড়ে বসেছে বিন্নির খই, মুড়ি, জিলিপি, গজা, বড়া, লাড্ডুর দোকান। সোহাগকে দেখলাম জিলিপি খাচ্ছে কচকচিয়ে। খেতে ইচ্ছা হলো। না, পরে খাবো। প্রথমে সবটা মেলা দেখে নিই একবার। দক্ষিণে আমলি গাছের নিচে দেখলাম, আম, লিচু, কাঠাল, কলা, ডাটা ও আরো আনাজ তরকারি। হরিদাসকে কলা কিনতে দেখলাম।

বাদাম, বুটভাজা, মোয়ার দোকানগুলোর পরই পেলাম বাতাসার দোকান। চিনির খেলনাগুলো খুব সুন্দর লাগছিল। উপরের দিকে হঠাৎ একটা সুরেলা শব্দ পেলাম। ধনুকের শব্দ, ঝাপ–ঘুড়ির মাথায় বেধে দেয়া হয়েছে। মুহূর্তে আমি অন্য সব কিছু ভুলে গেলাম। একটা ঝাপ ঘুড়ি কিনতে খুব ইচ্ছা হলো।

ইচ্ছাটা প্রকাশ করলে আলি বললো, ওটা তো পাচ টাকা লাগবে।

শুনে নিজেকে বুঝ দিলাম, আগামী মেলায় প্রস্তুতি নিয়ে এসে কেনা যাবে।

খুব গরম লাগছিল। ফাকা জায়গাটায় দাড়ালাম। তরমুজ বিক্রি হচ্ছে। পিপাসা। বুকের ছাতা ফেটে যাবার উপক্রম। তরমুজ খেতে ইচ্ছা হলো প্রবল। টকটকে লাল ফালিগুলো মুখের দিকে চেয়ে আছে। চার আনা এক ফালি। যদি কিনি পুজিটা সবটাই ফুরিয়ে যায়। মেলা দেখা এখনো অনেক বাকি। যদি অধিক পছন্দের কিছু মিলে যায়? মনার দোকানে পানি খেয়ে নিলাম।

সামনে এগোলাম। তাল পাতার সেপাই, কেচকেচি, বাশের বাশি এসব মামুলি জিনিস। আরো সামনে বসার কুরসি খাট, জলচৌকি, বেলুন, পিড়ি, খড়ম, বিধা, লাঙ্গল। এরপর মাছ, মাংস, সিদল, শুটকি মাছ। পরে নানান রকম মশলা, চমৎকার গন্ধ। দেখলাম উত্তর দিকে শেষ প্রান্তে শিমুল তুলা বিক্রি হচ্ছে।

মেরাজ, পল্টু ঘুড়ি কিনছে। আট আনার নিচে কোনো ঘুড়ি নেই। সুতাও আট আনা। ঘুড়িগুলো কেমন পেটকাটা! আকাশে যেমনই দেখাক, মাটিতে একদম সুন্দর না। সামনের দিকে এগোতেই মনটা খুশিতে নেচে উঠলো। খেলনার রাজ্য। মাটির খেলনা সব। সুন্দর। ঘোড়া, হাতি, পুতুল, পালকি, টিয়া পাখি, বাঘ, সিংহ, হরিণ, মোটর গাড়ি, আরো কতো কি। কি সুন্দর রঙ! লাল, নীল, হলুদ, খয়েরি, বেগুনি, ডোরাকাটা। অপূর্ব! আমি এগুলোর মধ্যে একেবারে ডুবে গেলাম। সবগুলোই কিনতে ইচ্ছা হলো। দাম করলাম। দাম শুনে মনটা মুহূর্তে খুব বেজার হয়ে গেল। চার আনায় কেনা যায় না। আমার কান্না পেল, ভীষণ কান্না। একটা দোকানের আড়ালে দাড়িয়ে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পর নিজের মনেই ভাবলাম, মন খারাপ করে লাভ কি? সামনে এগোই। দেখি। পশ্চিমের দোকানগুলোতে আছে পুতির মালা, আংটি, চিরুনি, আয়না, গলার হার, বল, বন্দুক, বেলুন, বাশি, চুরি, টিনের হাড়ি, প্লাস্টিকের পুতুল, ঝনঝনি, চুষনি লাটিম আরো কতো কিছু। সাবান, টাওয়েল, স্নো, পাউডার, চুলের কাটা, ক্লিপ। এখন আর দাম করি না। ভয়। মনটা দুর্বল হয়ে গেছে। শুধু দেখছি। দেখার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে।

নাগর দোলা। চড়ার জন্য মনটা এমন আকুলি–বিকুলি করলো! কিন্তু লাগে এক টাকা। সজোরে একটা চাবুক মেরে থামালাম। সামনেই ভাগ্য পরীক্ষার খেলা। ঘোষণা হচ্ছে, চার আনা ধরলে আট আনা হবে। আরো বেশি, এক টাকা, দুই টাকা, দশ টাকা। মন চাইলো ধরি, বাড়িয়ে নেই। পরিচিত দুই একজনকে দেখতে পেলাম। এগিয়ে গেলাম। বিষয়টা বুঝছি। কে যেন পেছন থেকে আমার জামা ধরে টানলো। ফিরে দেখলাম শেফালি। চোখে একটা সুন্দর লাল চশমা। চমৎকার লাগছে তাকে। আমি খুটিয়ে খুটিয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম। মনে হলো এ মেলার এটিই সবচেয়ে সুন্দর জিনিস।

কোন দোকান থেকে কিনেছিস? জিজ্ঞাসা করলাম।

সামনের দোকান থেকে। বললো সে।

কতো দাম?

চার আনা।

আমার ভেতরটা খুব খুশি হয়ে উঠলো। মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, চল চল, তাড়াতাড়ি আমাকে ওখানে নিয়ে চল।

গিয়ে দেখলাম লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের অনেক চশমা সারি সারি সাজানো রয়েছে। দেখলেই মন জুড়ায়। দুজনে অনেকক্ষণ বাছাবাছি করে একটা নীল রঙের পছন্দ করলাম।

দোকানি বললো, তোমাকে খুব মানাবে খোকা।

শেফালি বললো, তাই!

শেফালির দিকে চেয়ে মুচকি হাসলাম। মনে মনে বললাম, তোকে বেশি। দাম দেবো। পকেটে হাত দিলাম। কিন্তু একি! সিকিটা নেই। গেল কই?

শেফালি বললো, ঘড়ি পকেটে দেখো।

দেখলাম, নেই। ব্যস্ত হয়ে সংশয়ী চিত্তে প্যান্টের পকেট দুটোও দেখলাম। পেলাম না। এখন উপায়! বুকের ভেতরে ঢিব করে একটা শব্দ হলো। বিকালটা মাটি করে প্রায় সন্ধ্যা হলো। কতো ঘুরলাম। শেষে পুজি আর পছন্দে একটা মিল হয়েছিল, এখন সিকিটা নেই। এমনো হয়! কেন এমন হলো?

ভেতরটা ডুকরে উঠলো। বাধ ভাঙা নদীর মতো কান্না বেরিয়ে এলো।

আমার সশব্দ কান্নায় আশপাশের মানুষ জমে গেল। একজন জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে খোকা, এমন কাদছো কেন?

কান্না থামছিল না।

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। কান্নার জোর আরো বাড়ছিল।

সে তো চার দশকেরও বেশি সময় আগের কথা। চশমাটি কিনতে না পারার সেদিনের বেদনা আজও আমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে। এখন আমি সক্ষম, সন্তানদের অনেক দিয়ে থাকি। কিন্তু আমার বিধবা মা সেদিন চরম দারিদ্রের নাগপাশে থেকে আমার জন্য বহু কষ্টে যা বরাদ্দ করেছিলেন তা ছিল আমার প্রতি তার স্নেহ, ভালোবাসা প্রকাশের এক নির্দশন।

বেখৈরহাটি, ময়মনসিংহ থেকে

নানার যুগ

– মোহাম্মদ আবদুস সত্তার

ছোটবেলা বৃটিশ আমলে আমার বৃদ্ধ নানাজানের সরু ফ্রেমের পুরু কাচের এক জোড়া সুন্দর চশমা ছিল। ওই চশমাটা চোখে পরেই তিনি প্রতিদিন ভোরে সুললিত সুরে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। চশমা ছাড়া তিনি কোনো রকম চলাফেরা করতে পারতেন বটে। কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত করা সম্ভব ছিল না। তাই চশমাটা ছিল তার মহা মূল্যবান সম্পদ।

আমার চেয়ে বয়সে বড় মামাতো, খালাতো ভাইয়েরা কয়েকজন মিলে প্রায়ই নানাজানের চশমাটা নিয়ে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে যথাস্থানে রেখে যেতেন। আমি ছাড়া আর কেউ তাদের এই চশমা নেয়া এবং রেখে যাওয়ার ঘটনা জানতো না। কিন্তু চশমা দিয়ে তারা কি করতো এটা আমিও জানতাম না।

একদিন কৌতূহলবশত গোপনে তাদের পিছু নিয়ে দেখতে পেলাম তারা চশমার ওপর সূর্যের আলো ফেলে আগুন জ্বালিয়ে বিড়ি ধরিয়ে খাচ্ছে।

ভাইয়েরা অবশ্য আমাকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিল যেন তাদের এই ঘটনা কাউকে না বলি।

মার খাওয়ার ভয়ে আমিও চুপ ছিলাম।

হঠাৎ একদিন বিধি বাম। আল্লাহ নাখোশ হলেন তাদের ওপর। তারা চশমাটা নেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ চশমা দিয়ে তাদের বিড়ি ধরানোর কাজ সেরে যথাস্থানে রেখে যাওয়ার আগেই নানাজান কেন জানি চশমাটা খোজ করতে লাগলেন। এবং না পেয়ে ঘোষণা করলেন, তার চশমা চুরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার খানদানি নানাজানের চশমা চুরি করে কেউ নিয়ে যেতে পারে এ কথা তার বাড়ির কেউ বিশ্বাস করতো না।

এদিকে আমার চোরভাইয়েরা নানার হাতে ধরা পড়ার ভয়ে চশমাটা যথাস্থানে রেখে দিতে ভয় পেয়ে গেলেন।

নানাজানের চশমা চুরি হতে পারে এ কথা কারো বিশ্বাস না করার কারণ হলো, একবার এক চোর নানাজানের নাম লেখা তার পিতলের বদনাটা চুরি করে নিয়ে এক পিতল-কাসার দোকানে বিক্রি করতে গিয়ে দোকানদারের হাতে ধরা পড়ে যায়। কেননা দোকানদার নানাজানকে চিনতেন। চোর অবশ্য দোকানদারের হাত পা ধরে মাফ চেয়ে ছাড়া পেল।

দোকানদার ঘটনাটা জানিয়ে নানাজানকে তার বদনাটা ফেরত দিয়ে গেলেন।

তখন থেকে নানাজানের কোনো জিনিস চুরি করার সাহস কেউ পেতো না। তাছাড়া তখনকার দিনে প্রায় সব খানদানি বাড়ির কাছারিতে পিতলের বদনা, রূপার হুক্কা ইত্যাদি থাকতো। কোনোদিন তা চুরি হতো না।

আমার যে ভাইয়েরা মারের ভয় দেখিয়ে আমার মুখ বন্ধ করেছিল, এখন তারাই আমাকে ধরলো তাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। কারণ তারা জানেন যে, নানাবাড়ির বড়মামা আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। তিনি বিড়ি এবং তামাকও খেয়ে থাকেন। অবশ্য নানাজানের অগোচরে। আমি বড়মামাকে ভাইদের চশমা চুরি ও বিড়ি ধরিয়ে খাওয়ার কথা জানিয়ে এর সুরাহা করে দেয়ার জন্য বিশেষভাবে ধরলাম। ধূমপায়ী বড়মামা তার ধূমপায়ী ভাগ্নে-ভাইপোদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। কিন্তু কি উপায়ে চশমা যথাস্থানে রেখে দেয়া যায়, *যেন সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে!* অর্থাৎ চশমাও পাওয়া যায়, চোরও ধরা না পড়ে!

উপায় অবশ্য বড়মামাই বের করলেন। এক ছোট হুজুরের কাছে গিয়ে চশমা চুরির কথা জানিয়ে এমন একটা তাবিজ দিতে বললেন যেন চোর চশমাটা যথাস্থানে রেখে যায়। হুজুর যেহেতু টেনেটুনে ছোট হুজুর খেতাব পেয়েছেন সেহেতু তার দেয়া তাবিজ-কবজে কোনো উপকার বা ফল পাওয়া যাক বা না যাক, তিনি এক টাকা সোয়া পাচ আনা করে হাদিয়া নিয়ে তাবিজ-কবজ, পানি পড়া দিয়ে তার সংসার ভালোই চালাতেন।

নানাজানের অনুমতি নিয়ে বড়মামা হুজুরের প্রাপ্য এক টাকা সোয়া পাচ আনা দিয়ে একটা তাবিজ আনলেন। এবং তাবিজটা চশমা রাখার জায়গায় রেখে দিলেন। নানাজানকে বলা হলো, তাবিজের বরকতে চোর যথাস্থানে চশমা রেখে যাবে। এবং চোরদের অর্থাৎ মামার ধূমপায়ী ভাগ্নে-ভাইপোদের বলা হলো গোপনে চশমা যথাস্থানে রেখে যেতে।

পরের দিন ভোরে নানাজান যথাস্থানে চশমা পেয়ে তো মহা খুশি। ছোট হুজুরের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। চশমা দিয়ে বিড়ি ধরানোর রহস্যটা নানার দুষ্ট ধূমপায়ী নাতিবৃন্দ, আমি এবং বড় মামা ছাড়া অন্য কেউ জানতেই পারেনি।

সে যুগে এ ধরনের ঘটনা বললে কেউ বিশ্বাসও করতো না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, নানাজানের দুষ্ট নাতিরা তাদের এক বিজ্ঞানস্যারের কাছ থেকে চশমা দিয়ে আগুন ধরানোর পদ্ধতির কথা জেনেছিল।

নানাজানের যুগে অর্থাৎ আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগে বিনা প্রয়োজনে কেউ চশমা পরতো না। আমি যখন নানা হলাম তখন চোখের প্রয়োজন ছাড়াও নানান রঙটঙয়ের চশমা পরার রীতি চালু হয়ে গেল। সেদিন আমার স্কুল পড়ুয়া তিন নাতনি নুহা, রুহি এবং দিশা স্কুল থেকে এসে আমাকে জানালো যে, তারা চশমা পরে স্কুলে যায় বলে সহপাঠী বান্ধবীরা তাদের তিনজনের নাম দিয়েছে যথাক্রমে শাবানা, ববিতা এবং মৌসুমী। কারণ চশমা পরলে নাকি তাদেরকে ওই নায়িকাদের মতোই দেখায়।

মনে মনে খুশিই হলাম আর ভাবলাম, হায়রে! আমার নানার যুগ কেমন ছিল। আর আমি যখন নানা হলাম, তখন এ যুগ কেমন হয়ে গেল। শুধু চশমা পরার বদৌলতেই সিনেমার নায়িকাদের উপাধি পাওয়া যায়!

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

কৃকেট

– মোহাম্মদ কবিরুল ইসলাম পাপ্পু

আমার জীবনে এমন কোনোদিন আসবে আমি ভাবতে পারিনি। একদিন আমার সঙ্গীদের নিয়ে কৃকেট খেলতে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে কিছু দূর যাবার পর দেখতে পেলাম যে, সবার চোখে নতুন সানগ্লাস। আমি তো অবাক হলাম! নজরুল জয়ন্তীতে সবাই সানগ্লাস কিনেছে। তারা কতো টাকা দিয়ে কিনেছে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছি না।

একবার সাহস করলাম যে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি। আবার মনে করলাম, জিজ্ঞাসা করে কি লাভ? যদি সানগ্লাসের দাম বেশি হয় তাহলে তো আমি আর কিনতে পারবো না। তাদের সানগ্লাস দেখে মনটা ভেঙে গেল। তখন নিজেই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, একদিন সানগ্লাস কিনবো।

এভাবে সানগ্লাস ছাড়াই প্রথম রাউন্ডে তিনটি ম্যাচ খেললাম। তারপরে সুপারসিক্সে উঠলাম। সুপারসিক্সে খেলা আরম্ভ হলো, সুপারসিক্সে তিনটি খেলার মধ্যে একটি খেলায় হেরে যাই। তারপর কোনোমতে সেমিফাইনালে উঠলাম। সেই খেলার দিন আমাদের টিম ম্যানেজার আমাকে বললেন, সবার চোখে সানগ্লাস আছে, তোমার সানগ্লাস নেই। তুমি আমারটা নিয়ে খেলতে পারো।

বললাম, খেলা পেলে সানগ্লাসের প্রয়োজন হয় না।

তারপর খেলার জন্য মাঠে নামার প্রস্তুতি। অবশেষে মাঠে নামলাম, খেলা কিছু দূর যাবার পর একজন লোক বলে উঠলেন, এই পাপ্পুভাই, সবার চোখে সানগ্লাস, তোমার চোখে সানগ্লাস কোথায়?

তখন লজ্জায় সেই কথাটা বললাম যে, খেলা পেলে সানগ্লাসের প্রয়োজন হয় না।

আমরা সেমিফাইনালে জয়ী হলাম। আমার চিন্তা ছিল যদি ফাইনালে জয়ী হয় তাহলে যতো টাকাই লাগুক, একটা সানগ্লাস কিনবো। আমাদের ম্যানেজার প্রতি ফাইনালে জেতার জন্য আমাদেরকে টাকা দেন। আমাদের টিম ম্যানেজার খুব ভালো। তার নাম রুকুনুজ্জামান । আমি সানগ্লাসের জন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। অবশেষে ফাইনাল খেলা নির্ধারিত হলো। ফাইনাল খেলার জন্য প্র্যাকটিস আরম্ভ হলো। নির্ধারিত সময়ে খেলার জন্য মাঠে গেলাম। আমাদের প্রতিপক্ষ অনেক দূর দূরান্ত থেকে প্লেয়ার আনলো। কিন্তু তারা আর আমাদের সঙ্গে পেরে উঠলো না। অতএব তারা চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বঞ্চিত হলো। আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনেক আনন্দ উৎসব করলাম। তারপর আট দশ দিন বিশ্রাম নেয়ার পর আমাদের টিম ম্যানেজার সকলের হাতে প্রাইজ মানি হিসেবে টাকাগুলো দিলেন। তারপর আমার হাতে একটা সানগ্লাস দিলেন।

তখন বললাম, সানগ্লাস কেন?

তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে এটা উপহার দিলাম।

আমি সানগ্লাস পেয়ে যে খুশি হয়েছিলাম তা লিখে বোঝাতে পারবো না।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে

বিবর্তন

– মির্জা মতিয়ুর রহমান

এক.

সব ছেলেমেয়েদেরই প্রবণতা থাকে বড়দের জিনিস নিয়ে টানাটানির। যেমন নিজের জুতা স্যান্ডালের চেয়ে দশগুণ বড় সাইজের, বাবা অথবা বড় ভাইয়ের জুতা স্যান্ডাল পায়ে দেয়া, মায়ের শাড়ি, ব্লাউজ পরা। বড়দের জামা গায়ে দেয়া যার প্রান্ত হয়তো মাটিতে লুটাচ্ছে। বাবা বড় ভাইয়ের শেভিং রেজর, ব্রাশ নিয়ে সারা নাক মুখে সাবান লাগিয়ে শেভ করার অপচেষ্টা। এসব ব্যাপারে আমার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন আমার পিঠেপিঠি দুই বছরের বড় ভাই মাহবুব। যেটায় হাত দেবো সেটা নিয়েই তার কাড়াকাড়ি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মতো আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে আমারটা তার দখল করা চাই–ই।

একদিন দেখি আব্বার চশমাটা টেবিলের ওপর। এই সুর্বণ সুযোগে চশমাটা চোখে দিয়ে উঠানে হাটছি। বেশি পাওয়ারের চশমা। মাটি উচু–নিচু দেখায়। আমি উচু দেখে পা ফেলছি। আসলে ধোকা খাচ্ছি প্রতিবার। তবুও বেশ মজা পাচ্ছি এই খেলায়। এমন সময় বিরোধী দলের নেত্রীর মতো চিলকণ্ঠে আওয়াজ এলো, এই, চশমা আমাকে দে।

আমি প্রতিবাদী। মায়ের অনুমতি নিয়ে আমি চশমা হাতে নিয়েছি। অতএব এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমি কোনোক্রমেই এ অধিকার হাতছাড়া করবো না।
কিন্তু *চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।* গণতন্ত্র শুধু উপাধি পাওয়ার জন্য, সভা সমিতি আর খবরের কাগজে বিবৃতি দেয়ার জন্য। যে কোনো কিছুর বিনিময়েই হোক গদি আমার চাই-ই, এই আদর্শে সে আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো চশমা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য।
আমি প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। চশমা নিয়ে টানাটানি শুরু হলো। চশমার ফ্রেমের মাঝখানে ভেঙে দুই ভাগ। কাচ ভেঙে চুর চুর। মায়ের আষাঢ়ে কিলে রণভঙ্গ হলো। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে এমন রাম ধোলাই দিলেন আব্বা যা এই বার্ধক্যেও ভুলতে পারিনি।

দুই.

ছোটবেলায় চশমার জন্য, মার খাওয়ার জন্যই কি না জানি না পরবর্তীকালে চশমা অথবা সানগ্লাসের জন্য কোনো আকর্ষণই অনুভব করিনি। কলেজে এসে তো আমার প্রায় সব বন্ধুই সানগ্লাস পরতো।
ঘনিষ্ঠ বন্ধু রহমান (বর্তমানে লন্ডনবাসী) উপদেশ খয়রাত করতো, সানগ্লাস পরলে স্মার্ট দেখায়। তাছাড়া প্লাস পয়েন্ট হলো, মেয়েদের মুখ, চোখ, বুক সোজাসুজি দেখা যায়। অথচ ধরা পড়ার রিস্ক নেই।
বন্ধুরা টিপস দিতো, মেয়েদের পিছে *টাংকি* মারতে এই যন্ত্রটা অত্যন্ত উপকারী। তাদের কোনো প্রেসকৃপশনই আমাকে অনুপ্রাণিত করেনি, বরং চশমা অথবা সানগ্লাস পরা সহপাঠিনীদের এড়িয়েই চলেছি। তারা আমাকে গাল দিতো, শা... কলেজে এসেও সেই গাড়লই রয়ে গেল।
কলেজের শিক্ষার পাট চুকিয়ে ১৯৬২-তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জয়েন করি। একাডেমির ট্রেনিং, বিভিন্ন কোর্স, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে চার বছর পর প্রথম ছুটিতে এসেছি। পাড়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রুজি-রোজগারের ধান্ধায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বাসার কাছেই মুরাদ জেনারেল স্টোর। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় আমার কাটে এখানেই। ফক্কুর দোকানের চা, এখানে দিয়ে যায়। সিগারেট ফুকি। খবরের কাগজ পড়ি।
এভাবেই কাটছে সময়। হঠাৎ দেখি আমাদের প্রিয় সামাদমামা। মামার প্রশ্ন, *কে বারে কেংকা আচো?*
মামা সম্বন্ধে দুই কথা বলতে হয়। মামা আমার নানা-নানির শেষ বয়সের ফসল। আমার সমবয়সী। আদুভাইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। ক্লাস ফাইভে তিন বছর ফেল করার পর ছেড়ে দিয়েছেন। শিক্ষার প্রশ্ন উঠলে বলেন, উচ্চ প্রাইমারি ফেল। মামা নির্ভেজাল পূর্ব বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। আর বড় গুণ, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের খুবই ভালোবাসেন। প্রচুর খরচ করেন। মামার সঙ্গে বাসায় আসতে আসতে জানলাম এ ছুটিতেই আমার শাদি মোবারকের জন্য মামাকে মায়ের জরুরি তলব, কন্যা দেখতে হবে।

তিন.

বাসার সামনে একটা রিকশা দাড়িয়ে। ভাবলাম কোনো অতিথি এসেছে হয়তো। মামা গেটের কড়া নাড়লেন। শাড়ি পরা, লম্বা, ফর্শা, কোমরের নিচ পর্যন্ত খোলা চুল, কালো সানগ্লাস পরা যে মেয়েটা দরজা খুলে দিয়েই অ্যাবাউট টার্ন করলেন তার সেই রূপের বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। তাই সে অপচেষ্টা কররাম না। কেমন কে আচ্ছন্নের মতো মামার সঙ্গে গিয়ে বারান্দায় পাতানো চেয়ারে বসলাম।
মামা বললেন, কি বারে? কি হলো? তুর কথা কচ্ছু না ক্যান?
আমি নিশ্চুপ।
মামা স্বভাব সুলভ হাক দিয়ে উঠলেন, *কই গো বড়বু।*

মা বেরিয়ে এলেন, কি হলো তোর?

মাইয়াডা আমাগোরে মুমু না?

ততোক্ষণে মমতা বেড়িয়ে এসেছে। মামা বললেন, বড়বু দ্যাখো? অ্যাখন মুমুরে দ্যাখলে কেডা না কবো আইএ পাস।

উল্লেখ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে *আইএ পাস*। এটা মামার অতি প্রিয় বিশেষণ।

মমতা বললো, খালা, আমি যাই কলেজে।

মা বললেন, আজ না হয় না গেলি কলেজে?

মমতা বললো, না খালা, আজ আমার জরুরি ক্লাস আছে। মা বলেছিলেন কলেজে যাবার পথে তোমাকে বলতে যে, মামা এলে রাতে যেন মামা আর মতিভাইয়া আমাদের বাসায় খায়। এই বলে খাতা হাতে গট গট করে বেরিয়ে গেল।

চার.

আমি ভাবছি এই সেই সালোয়ার কামিজ পরা, ঝাকড়া চুল, খালাতো বোন মমতা। কথায় কথায় গুণ্ডামি। লেখাপড়া করে না, ফুটবল খেলে শুধু আর মারামারি করে কলেজে বলে আমাকে গাল দিতো, ধরতে গেলে হরিণীর মতো পালিয়ে যেতো। আজ সেই এই সানগ্লাস সুন্দরী মমতা কতো শান্ত, সৌম্য।

ডিসিশন নিলাম! বললাম মামাকে।

মামা ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত উঠিয়ে বললেন, *কইতে হবো না, ঠার পাইছি। তোমার হয়া গেছে?*

হ্যা! হয়েই গেছে আমার বিয়ে মমতার সঙ্গে। ছত্রিশ বছর সংসার করছি। সানগ্লাসের বদলে তার চোখে ঠাই নিয়েছে মোটা ফ্রেমের বেশি পাওয়ারের চশমা। আমার চোখে ততোধিক বেশি পাওয়ারের চশমা। চশমা কে আবিষ্কার করেছিল সে তাত্ত্বিক জ্ঞান আমার জানা নেই। তবে নিঃসন্দেহে, বৃদ্ধা-বৃদ্ধের জন্য এটা আল্লাহর এক বিশেষ রহমত।

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে

দাগ

– মহিবুর রহমান মহিন

তখন আমি ক্লাস টু-তে পড়ি। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে আমিই সবার ছোট। বোন একটা হওয়াতে সবার ভালোবাসা পাবার সেই বেশি দাবিদার। বাস্তবেও তাই। শুধু মায়ের কাছে আমি প্রথম।

মায়ের আদর আমার দুষ্টুমির স্পর্ধা বাড়িয়ে দেয়। এবং বিভিন্ন অজুহাতে সব সময় পড়া ফাকি দেয়ার সুযোগ খুজতে থাকি। সেদিন সকাল থেকেই মার পিছে পিছে ঘোরাফেরা করছি। কখনো রান্না-ঘরে, কখনো হাস-মুরগি খাবার দেয়ার কাজে ব্যস্ত, কখনো আবার নারিকেলের পাতা দিয়ে চশমা তৈরির কাজে মগ্ন আছি।

দেখতে দেখতেই সকাল নয়টা বেজে গেছে। আব্বার অফিস এবং আমাদের স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাবার রেডি করতে পারেননি। ফলে আব্বার মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে। আবার আমি সকাল থেকে পড়তে বসিনি বিধায় আমার উপর আরো বেশি রেগে আছেন। সেই বয়স থেকেই আমার চশমা পরার খুব শখ। তাই অনেক দিন ধরেই আব্বার কাছে চশমার বায়না ধরেছি। সাহস করে সকালেও আব্বাকে বলেছি আমার চশমার কথা।

আব্বা গোসল সেরে পেপার দেখতে দেখতে মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কই, তোমার খাবার রেডি হলো?

মাত্র দশ মিনিট দেরি করো, খাবার রেডি হয়ে যাবে।

হায় আল্লাহ! সাড়ে নয়টা বাজে। নাহ! তোমার খাবার খেতে গেলে সঙ্গে চাকরিটাকেও খেতে হবে। তারচেয়ে আমি অফিসে গিয়েই নাশতা করে নেবো। এই বলে আব্বা তাড়াতাড়ি করে জামা–কাপড় পরে ব্যাগটা নিয়ে বের হচ্ছেন। হঠাৎ খেয়াল করে দেখেন পকেটে চশমা নেই।

দেখো তো আমার চশমাটা কোথায় রাখলাম। খুজে পাচ্ছি না।

মা সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুজতে লাগলেন। কোথাও চশমা নেই। এবার আমাকে বলছেন, তোমার আব্বার চশমা দেখেছো? কোথাও খুজে পাচ্ছি না।

আমি এবার মনে প্রাণে খুজতে লাগলাম। কোথায়ও না পেয়ে আব্বার রুমে গিয়ে দেখি, চশমাটা হাতে নিয়ে এখানে–সেখানে খোজাখুজি করছেন। আব্বার সামনে গিয়ে দাড়লাম। বললাম, আব্বা, চশমা তো...। বলতেই আব্বার যে হাতে চশমা ছিল সেই হাত দিয়ে কষে একটা চড় মারলেন আমার পিঠে।

সঙ্গে সঙ্গে চশমার গ্লাস ভেঙে আমার পিঠ কেটে রক্ত বের হতে লাগলো।

আব্বা তখন বুঝতে পারলেন চশমা তার হাতে ছিল। আব্বার ভুল বুঝতে পেরে আমাকে বিছানায় উপুড় করে রেখে, নিজেই স্যাভলন তুলা দিয়ে আমার পিট ব্যান্ডেজ করতে লাগলেন। এবং আমাকে বলছেন, আব্বু, তুমি কি খুব ব্যথা পেয়েছো? আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার চশমা আনার কথা বলছিলে।

যাহোক, আজ আমি অবশ্যই তোমার চশমা নিয়ে আসবো। আব্বা সেই দিন অফিস থেকে আসার সময় আমার জন্য সুন্দর একটা সানগ্লাস নিয়ে এলেন।

অনেক দিন পর। পড়ালেখার পাট চুকিয়ে তখন আমি চাকরি করি। আমি ছাড়া অন্য সব ভাইবোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আজ আমার পালা। সেই আনন্দে বাড়ি গম গম করছে লোকজনে। কিছুক্ষণ পরেই বর সেজে, মুকুট মাথায় দিয়ে, মায়ের পছন্দ করা পাত্রীকেই বিয়ে করতে যাবো। এবার আমার গোসল করানোর পালা। ভাবীরা, চাচাতো বোনেরা সবাই মিলে গান গাচ্ছেন।

সাবান দিয়ে পিঠে হাত দিয়েই মা খেয়াল করলেন আমার সেই কাটা দাগ। মা স্তব্ধ হয়ে আছে দাগটার ওপর হাত রেখে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে মা?

মা বললেন, তোর পিঠের দাগটা তোর বাবার স্মৃতি। তার চশমায় কেটেছিল, মনে আছে তোর?

আব্বার কথা মনে করতেই বুকটা ভারী হয়ে গেল। আজ যদি আব্বা বেচে থাকতেন, কতোই না খুশি হতেন। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। মাকে জড়িয়ে ধরে কেদে কেদে বললাম, মনে আছে মা, যতো দিন আমি বেচে থাকবো, ততোদিন মনে থাকবে আব্বার কথা, আব্বার চশমার কথা। বয়সের কারণে আজ আমিও চশমা ছাড়া চলতে পারি না।

ফরিদপুর থেকে